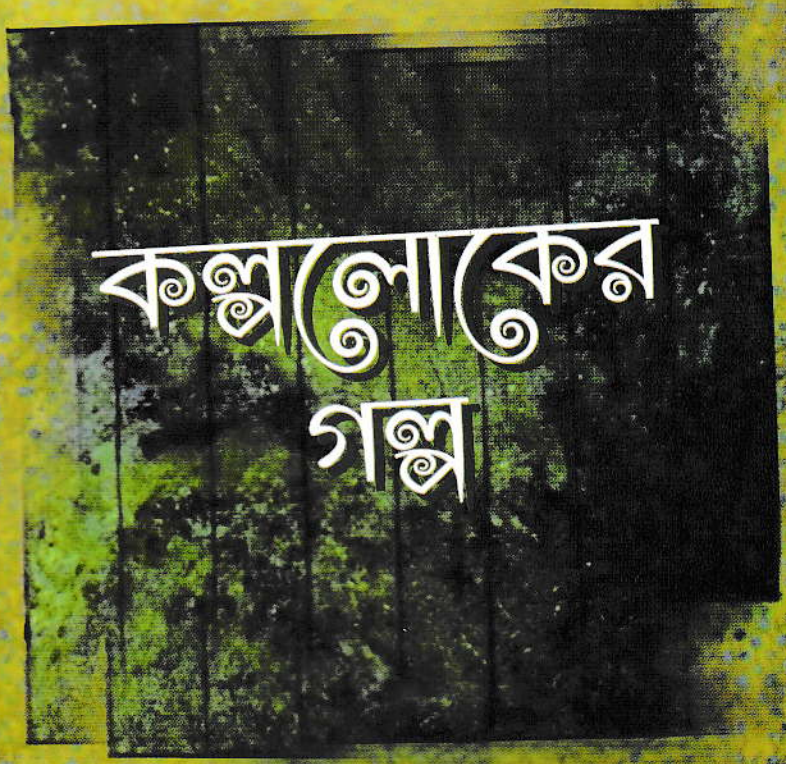

# কল্পলোকের গল্প

পূরবী বসু

# কল্পলোকের গল্প

পূরবী বসু

পুথিনিলয়

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
পুথিনিলয়

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক
শ্যামল পাল
পুথিনিলয়
৩৮/২-ক, মান্নান মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮০২৯৫৮২১৫৬
ই-মেইল : puthiniloy2@gmail.com

প্রচ্ছদ
সুমন বৈদ্য

কম্পোজ
নির্বাচিতা কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
২/১, তনুগঞ্জ লেন
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

দাম
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN 978-984-92118-5-3

Kalpoloker Golpo. By Purabi Bose. Published by : Puthiniloy.
38/2-Ka. Mannan Market. Banglabazar. Dhaka-1100.

*উৎসর্গ*

*প্রিয় অনুজদ্বয়*

*স্বপন বসু ও আশীষ বসু*

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| অরন্ধন | ৯ |
| আজন্ম পরবাসী | ১৫ |
| সময়ের স্বদেশ দর্শন | ২০ |
| আত্মরক্ষার দশ উপকরণ | ২৬ |
| জীবনবৃক্ষে রিপু-রঙ | ৩৪ |
| স্বয়ম্বরা | ৪০ |
| অবশেষে মুখোশবিহীন | ৪৩ |
| মহীলতা | ৪৮ |
| লখিন্দরের বাসর | ৫৬ |
| মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ | ৬৪ |
| একের ভিতরে পাঁচ | ৬৮ |
| সে তখন উল্টো করে জামা পরত | ৭৬ |
| হিরের আংটি ও আঙ্গুরবালা | ৮১ |
| ঈশ্বর ও নারীর পরিবার-পরিকল্পনা | ৮৩ |
| ফিরে চায় ছায়া | ৮৮ |
| বারে বারে ফিরে ফিরে | ৯৪ |
| জোছনা করেছে আড়ি | ১০৭ |
| একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত | ১১২ |



**For more Bangla Books**
**Please Click HERE**

# অরন্ধন

ভোর হইয়াও হইতেছে না। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে চারিদিকে।

শেফালি ফুলের সৌরভ আর সাদা কমলার অপূর্ব সমাহার রাধা বিছানা হইতেই স্পষ্ট টের পাইতেছে।

গতকাল রাত্রিতে স্বামী, শাশুড়ি অথবা ননদিনী কাহারও সঙ্গে কোনো রকম বচসা হয় নাই রাধার, যাহা যখন তখন, যেইখানে সেইখানে প্রতিদিনই ঘটিয়া থাকে।

শরীরে বাড়তি উত্তাপ নাই– অতএব জ্বর হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য কোনো রকম দৈহিক বৈকল্য অথবা ক্লান্তিও অনুভব করিতেছে না সে।

বাহিরে বৃষ্টি নাই। আকাশ পরিষ্কার। সুনীল।

শীত অথবা উষ্ণতা কোনোটাই বিরক্তিকর পর্যায়ে উপনীত হয় নাই। রাধার একমাত্র সন্তান সাধন সম্পূর্ণ সুস্থ।

স্বামী ও পুত্র এখন পর্যন্ত পাশেই নিদ্রানিমগ্ন।

তবুও রাধা হঠাৎ স্থির করিল আজিকে সে রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

সূর্যকে ডাকিয়া রাধা বলিল, "আজ তুমি দেরিতে উঠিবে। কারণ আমি অনেকক্ষণ বিছানায় থাকিব।"

অন্ধকারের সহিত কথা বলিবার সুযোগ হইল না। কেননা রাধার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বেই আঁধার বিদায় লইয়াছে।

পাখিকে ডাকিয়া বলে রাধা, "তোমরা আজ ঘুম ভাঙানিয়া গান থামাইও না। আমি জাগিয়া জাগিয়া শুইয়া শুইয়া সেই গান শ্রবণ করিব।"

মেঘকে ডাকিয়া বলিল, "সূর্যকে সাহায্য কর। উহাকে লুকাইয়া রাখ তোমাদের শাড়ির অঞ্চলে।"

শেফালিকে লক্ষ করিয়া উপদেশ দিল, "আর ঝরিয়া পড়িও না। মনে কর রাত্রি প্রভাত হয় না।"

শিশিরকে বলিল, "তুমি বিন্দু বিন্দু ফোঁটায় ঘাসের উপর নামিয়া আসিতে থাক।"

সূর্য কথা শুনিল রাধার। অনেকক্ষণ সে আকাশে উদিত হইল না।

মেঘ আসিয়া সুনীল আকাশ ঢাকিয়া রাখিল।

পাখিরা রাত্রিশেষের গান ক্রমাগত গাহিতে লাগিল।

শেফালি বোঁটা শক্ত করিয়া আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য লইয়া বৃক্ষে শোভা পাইতে লাগিল।

শিশিরবিন্দু অনবরত ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িয়া তাহাদের ভালোবাসায় সিক্ত করিল।

রাধা আড়মোড়া ভাঙিয়া এপাশ হইতে ওপাশে গড়াইয়া শুইল।

ইতোমধ্যে বাড়িতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙিতে সকলেরই বিস্তর বিলম্ব ঘটিয়াছে আজ।

নামতা আর আদর্শলিপি ভুলিয়া সাধন পুনঃপুন বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

রাধার স্বামী আয়ানের হাটে যাইবার সময় উপস্থিত।

ননদিনী বিদ্যালয়ে যাইতে প্রস্তুত।

প্রভাতী উপাসনা সাঙ্গ করিয়া শাশুড়ি ঠাকুরণ দিনের প্রথম আহার গ্রহণ করিতে উন্মুখ।

অথচ রাধা তখনও শয্যায়।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

"কী হইল? হইলটা কী?"

"সকলেই কি উপবাসী হইবে আজ?"

"ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হইতেছে না।"

সমস্বরে শাশুড়ি ননদিনী ও স্বামীর ব্যাকুল প্রশ্ন।

রাধার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই।

শয্যা ছাড়িয়া সে মন্থর গতিতে মাটিতে নামিল।

ঘরের কোনায় রক্ষিত কলসিখানা কাঁকে লইয়া ধীরে ধীরে পুকুরের দিকে ধাবিত হইল।

"পুত্র কি আমার বিনা আহারেই কাজে যাইবে আজ?"

রাধা নিরুত্তর। শাশুড়ি ক্রুদ্ধ।

"বলি এত দেমাগ কোথা হইতে আসিল? হইলটা কী?"

রাধা নিরুত্তর। স্বামী বিস্মিত।

"বৌঠান, আমার পাঠশালায় যাইবার সময় হইল।"

রাধা নিরুত্তর। ননদিনী বিষণ্ন। চিন্তিত।

পুকুরঘাটে আসিয়া জলে পা ডুবাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে রাধা। পশ্চাতে মিলিতকণ্ঠের গুঞ্জন নয়– রীতিমতো চিৎকার। ইতোমধ্যেই তীব্র বিলাপের মাধ্যমে পাড়াপ্রতিবেশীর কয়েকজনকে একত্রিত করিয়াছেন শাশুড়ি। রাধা নির্বিকার। জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপচাপ বসিয়া আছে সে।

পুঁটি, বজুরি, খলিসা, আর কাজলী ঝাঁক বাঁধিয়া দৌড়াইয়া আসে রাধার পায়ের কাছে।

"যাও তোমরা এইবারটি সরো। তোমাদের কাহারও জন্য আহার আনি নাই আজিকে।"

মাছেরা তবু সানন্দে ডিগবাজি খায়। রাধার উপস্থিতিই তাহাদের চঞ্চল করে। অন্য কিছু চাহে না তাহারা।

আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাধা। মুখ টিপিয়া সূর্য হাসে।

"রাগ করিয়াছ?" সূর্যের প্রশ্ন।

"কেন, আরেকটু বিলম্ব সহিল না তোমার?" অভিমান-বিক্ষুব্ধ স্বরে রাধার জিজ্ঞাসা।

"ক্ষেতের শস্যসমূহের দৃষ্টি বুলাইলেই বুঝিবে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইলে কী ঘটিত।"

রাধা পুকুরপাড়ে মৃতপ্রায় শস্যক্ষেত্র অবলোকন করে। "উহারা বাঁচিবে তো?" রাধা চিন্তিত।

"তুমি একবার হাসিলেই উহারা আবার জাগিয়া উঠিবে।"

রাধা দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের চারিদিকে এক পাক ঘুরিয়া মন খুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার দুই বাহু দুইদিকে শূন্যে প্রসারিত।

রাধা হাসিতেছে। হাসিতেছে। হাসিতেছে।

সবুজ শস্যক্ষেত্র যেন এইমাত্র ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। নড়িয়াচড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল তাহারা।

রাধা হঠাৎ আবিষ্কার করিল তাহার স্বামী আসিয়া দুই ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকাইতেছে তাহাকে।

চোখের সম্মুখে শাশুড়ি অগ্নিদৃষ্টি আর কঠিন বাক্যবাণ দিয়া তাহার সম্পূর্ণ শরীরে হুল ফুটাইতেছ।

ননদিনী অভিমানে ক্রন্দন করিতেছে।

রাধা তবু হাসিতেছে। হাসিতেছে। হাসিতেছে। রাধা হাসিতেছে।

রাধার সঙ্গে তাল মিলাইয়া শিরশির করিয়া হাওয়া বহিতেছে।

পুকুরের জল ছোট ছোট তরঙ্গ তুলিয়া খিলখিল করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

পাখিরা কিচিরমিচির শব্দে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে।

মাছেরা নাচিতেছে-ভাসিতেছে-ডুবিতেছে।

ফুলেরা পাতার সহিত একতা ঘোষণা করিয়া মৃদুভাবে মাথা নাড়াইতেছে।

রাধা হাসিতেছে। হাসিতেছে। হাসিতেছে।

ক্রোধান্বিত স্বামী আছাড় দিয়া ভাতের হাঁড়ি ভাঙিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই হাটের পথে যাত্রা শুরু করিল।

শাশুড়ির বিলাপ আর অভিশাপ উচ্চলয়ে বাজিতে থাকে।

ভীত ননদিনী এক-পা দুই-পা করিয়া প্রতিবেশীর বাড়ি সরিয়া পড়ে।

পুত্র সাধন আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়ায় পুকুরের কিনারায়।

রাধা তবু রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

রাধার মাথাটা হঠাৎ এক পাক ঘুরিয়া যায়।

বমনের ইচ্ছা একবার বুক চাপিয়া উঠিয়া আসে। কোনোমতে তাহা দমন করে সে।

মাটিতে বসিয়া পড়ে রাধা। আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়। সে যে অসুস্থ নহে সেই সম্পর্কে সে অবগত। জীবনের সবচাইতে সুস্থ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই যে অসুস্থতার জন্ম দেয় রাধা কেবল তাহাই অনুভব করিল একবার। সুতরাং সে ভীত নহে।

"মা আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে।"

দূর হইতে কে যেন আবার বলিল, "মা আমার খুব ক্ষুধা লাগিয়াছে।"

রাধার হৃদয়ে একটা বড়োরকম তোলপাড় শুরু হইল। শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ উপস্থিত হইল প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। পুত্রকে বুকে জড়াইয়া সে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল জলের দিকে।

তারপর আকাশের দিকে। সূর্যের দিকে।

তারপর গাছ, পাখি, ফুল, পাতার দিকে।

রাধা তাহার চারিদিক গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

একটা কাক উড়িয়া আসিয়া টুপ করিয়া একখানা ছোট্ট পাকা পেঁপে ফেলিয়া গেল রাধার কোলে। দুই হাতে তাহা খুলিয়া রাধা পুত্রের মুখে পুরিয়া দিল। সাধনের ক্ষুধা তাহাতে মিটিল না। রাধা মাছরাঙাকে ডাকিয়া কহিল, "পুকুরের মধ্যখানে যে শাপলা ঝাড়, তাহার মধ্য হইতে সবচাইতে বড়ো ঢ্যাপটা তুলিয়া আন আমার সন্তানের জন্য।"

ঢ্যাপটা আকারে বৃহৎ-ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু রাধার পুত্র তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ভক্ষণ করিল।

"মা আমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে। তুমি রাঁধিবে না?"

চতুর্থ বর্ষ সমাপ্ত করিয়াছে সাধন। উহার উদরে এখন প্রচণ্ড ক্ষুধা। গাছের সামান্য ঐ ফল কেমন করিয়া পারিবে এই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে?

"মা, তুমি রাঁধিবে না?"

বুক ভাঙিয়া যাইতে চাহে। আর বুঝি পারা যাইবে না।

তবু কোনোমতে রাধা কহে, "না।"

রাধা রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

সাধনকে বক্ষে চাপিয়া পুকুরঘাট হইতে রাধা ফলের বাগানের গহিনে চলিয়া আসে। জোড়াসন কাটিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পুত্রকে কোলের ওপর শোওয়াইয়া দেয়। তারপর একবার এইদিক একবার ঐদিক সতর্কতার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আশেপাশে কেহই নাই। হাওয়ার দাপটে জামরুল আর কাঁঠাল গাছগুলির ডালপাতা নড়িয়া চড়িয়া রাধার চারিদিকে একটা মৃদু বেষ্টনীর সৃষ্টি করে। রাধা আস্তে আস্তে বুকের কাপড় সরায়। খোলা আকাশের নিচে তাহার উন্মুক্ত বক্ষের সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট স্তনযুগল সূর্যের আলোকে ঝলমল করে। রাধা তাহার বাম স্তনবৃন্ত সন্তানের মুখে তুলিয়া দেয়। আর তাহার দক্ষিণ হস্ত অনবরত সাধনের মাথা, চুল,

কপাল আর চক্ষে আদর বিলাইতে ব্যস্ত থাকে। অনভ্যস্ত সাধন প্রথম কয়েক মুহূর্ত ঘটনার আকস্মিকতায় চমকাইয়া যায়। তাহার পর ধীরে, খুব ধীরে সে মায়ের স্তনকলি অতি আগ্রহে মুখের ভিতর টানিয়া লয়। প্রথমে একটু– তারপর আরও একটু জোরে– তারপর সমস্ত শক্তি দিয়া সাধন তাহার সবচাইতে নিরাপদ খাদ্য মায়ের শরীর হইতে শুষিয়া লইতে চেষ্টা করে।

রাধা চিন্তিত। রাধা উন্মুখ। কিছুই ঘটিতেছে না। এখন সে কী করিবে? মেরুদণ্ড সোজা করিয়া হাঁটু ছড়াইয়া আরও আরাম করিয়া বসে রাধা। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলায়। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রাধা কিছু কামনা করে– ইচ্ছা করে। আর ঠিক তক্ষনিই তাহা ঘটে। ঝর্ণার মতো কূল কূল করিয়া, সমস্ত শরীর শিরশির করিয়া কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া, দুই পাড় প্লাবিত করিয়া, বাঁধভাঙা বন্যার মতো নামিয়া আসে কিছু তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া।

রাধা তাকায় সন্তানের মুখের দিকে।

খিলখিল করিয়া হাসিতেছে সাধন।

আর তাহার ক্রিয়াশীল ঠোঁটের দুই কষ বাহিয়া সাদা সাদা দুধের ফেনা ঝরিয়া পড়িতেছে মাটিতে টুপ টুপ করিয়া।

রাধা হাসিতেছে।

সাধন হাসিতেছে।

মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

এক পায়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শালিক বিশ্রাম লইতেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে।

রাধা হাসিতেছে।

সাধন হাসিতেছে।

রাধা ঠিক করিয়াছে আজিকে সে রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

# আজন্ম পরবাসী

বহুদিন আগে তুতকি নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজা যেমন ছিল অত্যাচারী তেমনি অকর্মণ্য ও অসৎ। ফলে রাজ্যের সাধারণ লোকের দুঃখের কোনো সীমা ছিল না। তুতকি রাজ্যে প্রধানত দুই সম্প্রদায়ের লোক বাস করত; তুতকি আর তয়তয় সম্প্রদায়। এই দুই শ্রেণির লোকজনের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের চেহারা, খাওয়াদাওয়া, পোশাকআশাক, কথাবার্তা চালচলনে কোনোই তারতম্য ছিল না। শুধুমাত্র নাম শুনে তাদের পার্থক্য যাচাই করা যেত। তয়তয় সম্প্রদায়ের সকলের নামই 'য়' দিয়ে শেষ আর তুতকি সম্প্রদায়ের নাম 'কি' দিয়ে শেষ। অত্যাচারী রাজা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর তিরস্কার এড়াতে প্রায়ই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যে তয়তয় সম্প্রদায়কে দায়ী করত। তয়তয় সম্প্রদায়ের সততা, দেশপ্রেম সম্পর্কে হাজার রকম প্রশ্ন তুলে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজের অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টায় ছিল তুতকি রাজা। তেমন এক অপপ্রচেষ্টার শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন তয়তয় সম্প্রদায়ের এক প্রৌঢ় দম্পতি। মৃত্যুর আগে তাঁরা তাঁদের তিন পুত্রকে বলে গেলেন তুতকি রাজ্য ছেড়ে দূরে-বহুদূরে চলে যেতে। তাঁরা বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যাতে তিন ছেলে তিন দিকে যায়– যথাক্রমে পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে। এতে করে অন্তত একজন হয়ত বেঁচে থেকে তাঁদের বংশের উত্তরাধিকার বজায় রাখতে পারবে। এই তিন ছেলের নাম আলয়, নিলয় ও সময়।

তিন ভাই সদ্য পিতামাতাকে হারিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যেভাবে হোক বেঁচে থাকতে হবে। যুদ্ধ, বিক্ষোভ অথবা সুবিচার কোনোটাই সম্ভব নয় প্রাণে বেঁচে থাকতে না পারলে। পিতামাতার নির্দেশানুযায়ী তিন ভাই রাতের অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের ভেতর এক নাগাড়ে বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে পরিত্যক্ত এক দালান আবিষ্কার করল। মা-বাবার কথানুযায়ী এই দালান তুতকি রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষে। এখান থেকেই তিনজনকে তিন দিকে বেরিয়ে পড়তে হবে। যাবার পথে চাকু দিয়ে গাছ কেটে কেটে চিহ্ন দিয়ে যাবে যাতে সামনের বছর ঠিক এই মাঘী পূর্ণিমার রাতে তারা আবার ফিরে আসতে পারে জঙ্গলে ঘেরা পরিত্যক্ত এই দালানে– যে মিলনস্থলে ওরা নিজেদের বসবাসের কাহিনী খুলে বলবে পরস্পরকে। পরে ভালোমন্দ বিবেচনা করে তিন ভাই ঠিক করবে যে যার জায়গায় পুনরায় ফিরে

যাবে, নাকি সবাই একত্রে যাবে কোথাও স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার জন্য। রাত ভোর হবার আগেই ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিল। নিলয় উত্তরে, সময় পশ্চিমে ও আলয় পূর্বে। আকাশের বিশাল গোলাকার চাঁদ ওদের এই নির্ভীক, দুঃসাহসী, একাকী অভিযানে শুধু সাথি নয়, প্রহরীও হয়ে রইল।

পরের বছর মাঘী পূর্ণিমা। আকাশে সেই পুরনো পরিপূর্ণ চাঁদ। মধ্যরাত।

একে একে তিন ভাই নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী সেই ভাঙা পরিত্যক্ত দালানে এসে জড়ো হয়েছে। রাত ভোর হবার আগেই জানতে হবে কে কেমন আছে, কে কোথায় ফিরে যাবে। ফলে সময় নষ্ট না করে তারা নিজেদের বর্তমান বাসস্থানের কাহিনী বলতে শুরু করল।

*নিলয়ের কাহিনী*

তিন দিন তিন রাত্রি পায়ে হেঁটে নিলয় অবশেষে যে রাজ্যে প্রবেশ করল তাকে চোখে দেখে তুতকি রাজ্য থেকে আলাদা করার উপায় নেই। এমনকি লোকজনের চেহারা, বাড়িঘর, গাছপালা সবই তুতকি রাজ্যের মতো। তাই অভুক্ত, ভীত নিলয় প্রথমেই একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল রাজ্যটির কী নাম। জানা গেল রাজ্যের নাম তয়তয় রাজ্য। নিশ্চিত হলো সে আরও যখন তার নাম নিলয় শুনে কেউ ভুরু কোঁচকালো না। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য তুতকি রাজ্যের লোকেরাও তা করে না। কিন্তু যে প্রচণ্ড তাণ্ডবে গত কিছুকাল কেটেছে, যে ভয়ঙ্কর সময়টাতে নিলয় তার মা-বাবাকে হারিয়েছে– তখন তার নাম শুনে লোকজনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না এমন অবকাশের সুযোগ রাখেনি তুতকি রাজা। নিলয় তাই পরিতৃপ্ত।

আলয় ও সময় : কী ভালো লাগে ও রাজ্যের?

নিলয় : দেশ ছেড়ে এসেও সব কিছু দেশের মতো। যদিও লোকজন কথা বলে একটু অন্যরকম করে, তবু তাদের ভাষা বুঝতে পারি, তারাও আমার ভাষা বুঝতে পারে। তয়তয় রাজ্যে লোকজন প্রায় একই খাবার খায়, রান্না করে একটু অন্যভাবে। একই পোশাক পরে, শুধু অন্যরকম করে পরে একটু। সবচেয়ে বড়ো কথা এ রাজ্যে 'নিলয়' নাম বললে কেউ সন্দেহ করে না। একই রকম দেখতে বলে বাইরে থেকে আসা আগন্তুক হওয়া সত্ত্বেও চট করে সকলের চোখে সেটা পড়ে না।

আলয় ও সময় : কী খারাপ লাগে ও রাজ্যের?

নিলয় : তয়তয় রাজ্যে তয়তয় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি রাজা এবং জনগণের অবহেলা ও অবজ্ঞা। ওখানকার সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা তুতকি

রাজ্যের মতোই প্রগাঢ়। খারাপ লাগে নিজের মাতৃভূমির এত কাছে থেকেও দূরে থাকার যন্ত্রণা। সবকিছু এত এক হওয়া সত্ত্বেও এত আলাদা যে প্রতিনিয়ত তুতকি রাজ্যের কথা মনে পড়ে যায়।

আলয় ও সময় : তাহলে কি চলে আসবে ও দেশ ছেড়ে?

নিলয় : না। বেশ আছি ভালোমন্দ মিলিয়ে। অনিশ্চয়তায় কোথায় পা বাড়াব আবার?

*সময়ের কাহিনী*

সাত দিন সাত রাত্রি একাধারে হেঁটে এবং নৌকা পাড়ি দিয়ে যে রাজ্যে এসে পৌঁছাল সময় সে রাজ্যের নাম তুতন রাজ্য। এ রাজ্যের সঙ্গে তুতকি রাজ্যের কোনো ব্যাপারেই কোনো মিল নেই। এমনকি মানুষগুলো পর্যন্ত দেখতে অন্যরকম। তাদের পোশাকআশাক, তাদের খাবারদাবার, তাদের পছন্দ-অপছন্দ সবই আলাদা। আর তাদের ভাষা? প্রথম প্রথম তো সময় এক ফোঁটাও বুঝতে পারত না। এখন আস্তে আস্তে সে ভাষাটা কিছুটা শিখে নিয়েছে। ওদেশের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট অন্যরকম, গাছপালা আলাদা। এমনকি আবহাওয়া পর্যন্ত তুতকি রাজ্যের মতো নয়।

আলয় ও নিলয় : কী ভালো লাগে ও রাজ্যের?

সময় : ভালো লাগার জিনিসের শেষ নেই তুতন রাজ্যে। ওখানে অগাধ খাবার, সুন্দর পোশাক, প্রচুর টাকা এবং সাজানো বাড়ি সকলের। লোকজনের পেটে পুষ্টিকর খাবার, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। রাস্তাঘাটে কোনো ক্ষুধার্থ দুঃখী লোক নেই। অসুখ খুব কম, হলেও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে সকলের জন্যে। ওখানে 'সময়' নাম শুনলে কেউ সন্দেহের চোখে দেখে না। ওখানকার রাজা তুতকি রাজার মতো অত্যাচারী নয়, লোকজনের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ সবসময়ই রয়েছে তার।

আলয় ও নিলয় : ওখানে কি কিছুই খারাপ লাগে না তোর?

সময় : লাগে। কেননা, সব পেয়েও না পাবার ব্যর্থতা সর্বক্ষণ রয়েছে সেখানে। প্রচুর খাবার থাকলেও দেশি কিছু কিছু খাবার মাথা কুটলেও মিলবে না। নিজের ভাষায় মন খুলে কথা বলতে পারি না। নিজের পোশাক যা পরে অভ্যস্ত তা সেখানে অচল। সবচেয়ে বড়ো কথা নিজের ভালো থাকা কখনোই ভালো লাগতে পারে না যতক্ষণ না এই ভালো থাকার অংশীদার করে কোনো প্রিয়জনকে পাওয়া যায়। ও রাজ্যে মনমতো একাত্ম হয়ে মিশে যাবার মতো তেমন বন্ধু বা আত্মীয় নেই আমার। ওখানকার লোকরাও এত আলাদা, ইচ্ছে করলেও ভোলা যায় না এটা বিদেশ।

আলয় ও নিলয় : তাহলে কি চলে আসবি রাজ্য ছেড়ে?

সময় : না। বেশ আছি খেয়েপরে নিশ্চিন্তে। অনিশ্চয়তায় কোথায় পা বাড়াব আবার?

*আলয়ের কাহিনী*

পূর্বের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সারাদিন সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলা যেখানে এসে পৌঁছাল আলয় সে জায়গাটা মোটেই তুতকি রাজ্যের মতো নয়। তুতকি রাজ্যের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি প্রায় অনুপস্থিত এখানে। জায়গাটা প্রধানত পাহাড়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রচণ্ড খিদে পেল আলয়ের। বামদিকে রাস্তা ধরে গেলে লোকালয় খুঁজে পাবে এমন একটা অদম্য আশায় ভর করে আলয় বামদিকের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ আলয়ের কেমন যেন মনে হতে থাকল এ জায়গায় এর আগে কখনো এসেছে সে। মন থেকে গা ঝাড়া দিয়ে এ চিন্তা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল আলয় এই বলে যে, সারাজীবনে তুতকি রাজ্যের বাইরে সে কখনো পা দেয়নি। কিন্তু কিছুতেই সে চিন্তা মন থেকে যায় না। ভোর হয়ে এসেছে। লোকজন এখনও জাগতে শুরু করেনি। আরেকটু যেতে একটি চারমাথার সংযোগস্থলে এসে দাঁড়াল। ডানদিকে মস্তবড়ো একটা বটগাছ। আলয়ের হঠাৎ মনে হলো এই ডাইনের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে কিছুক্ষণ বাদেই একটি দোতলা লাল দালান দেখবে সে, তারপর মস্তবড় একটি পুকুর। পুকুরের উল্টোদিকে সাদা মারবেল পাথরের এটি বাড়ি। আলয় প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে ডানদিকে যেতে শুরু করল। আর আশ্চর্য ঠিক তাই। সেই লাল দালান, তবে দোতলা নয়, তিনতলা। তারপর সেই লম্বা পুকুর। পুকুরে পাড়ে শ্বেত পাথরের মস্ত দালান। আলয় নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। না, জেগেই আছে আলয়। তবে হৃৎপিণ্ডটা খুব দ্রুত উঠানামা করছে তখন। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুটে গেল আলয় পুকুরের বাঁধানো ঘাটের দিকে। চার, পাঁচ, ছয়, সাত। তর তর করে সিঁড়ে ভেঙে জলে ডোবা প্রথম সিঁড়িটিতে এসে দাঁড়ালো আলয়। তারপর পিছন ফিরে প্রতিটি সিঁড়ির গায়ে পরিচিত কিছু খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে জলে ডোবা সিঁড়িটার শ্যাওলা দু'হাতে ঘষে ঘষে অমূল্য ধনের মতো কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল আলয়। তারপর যা সে আবিষ্কার করল তাতে হাত-পা অবশ হয়ে এলো তার। শ্যাওলার নিচে সিঁড়িতে পরিষ্কার করে লেখা "আ+নি"। আর কোনো সন্দেহ নেই। স্মৃতির কুয়াশা মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। আলয় পরিষ্কার বুঝতে পারল এখানে সত্যি সত্যিই আগে এসেছে সে। ছোটবেলা মামাবাড়ি বেড়াতে এলে একবার ছোটমামা

আলয় ও নিলয়কে নিয়ে মেলাতে গিয়েছিলেন। মেলায় যেতে পথে এই গ্রামে থেমেছিল তারা। পুকুরঘাটটার বাঁধানোর কাজ চলছিল। সিমেন্টের নরম স্তর দেওয়া হয়েছিল সবে। ছেলেমানুষ দুই ভাই নিজেদের নামের আদ্যাক্ষর লিখে রেখেছিল সেই নরম সিমেন্টের গায়ে মামার একান্ত অগোচরে। ফলে স্তম্ভিত আলয় আবিষ্কার করল এত পথঘাট পেরিয়ে সে তখনো তুতকি রাজ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়। সেখানেই অতঃপর থেকে গেল আলয় পুরো একটি বছর।

নিলয় ও সময় : ওখানে কী ভালো লাগে তোর?

আলয় : সবকিছু ভালো লাগে। নিজের মাটিতে, নিজের লোকজনের সাথে আছি। সারা জীবন যেভাবে থেকেছি, যেভাবে কথা বলেছি, যা খেয়েছি, যে পোশাক পরেছি ঠিক সেভাবে সব করছি আজো। চারদিকেই বন্ধুবান্ধব-পরিচিত। আর কী চাই?

নিলয় ও সময় : তাহলে কি মা-বাবা ভুল করেছিলেন? তুতকি রাজ্য ছেড়ে যাবার কি কোনো দরকার ছিল না? আমাদের মতো কিছুই কি হারাতে হয়নি তোকে?

আলয় : হয়েছে।

নিলয় ও সময় : সেটা কী?

আলয় : আমার নাম। আমাকে আলয় বললে কেউ চিনবে না ওখানে। আমার নাম আলকি।

নিলয় ও সময় : তুই কি ওখানেই ফিরে যাবি, নাকি চলে আসবি অন্য কোথাও?

আলয় : না, ওখানেই ফিরে যাব। নিজের বাড়ি, নিজের মাটি ছেড়ে কোথায় কোন অনিশ্চয়তায় পা বাড়াব?

রাত ভোর হতে বেশি দেরি নেই। অতএব, তিন ভাই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আবার রওনা হলো যে যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

সময় পশ্চিমে।

নিলয় উত্তরে।

আর আলয় পূর্বে।

মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ এবারো ওদের একক চলার সাথি ও সাক্ষী হয়ে রইল।

# সময়ের স্বদেশ দর্শন

সময়ের কথা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। কয়েক বছর আগে ওর কথা বলেছিলাম আপনাদের। সেই যে আজন্ম পরবাসী তিন ভাই মা-বাবাকে হারিয়ে তিন দিকে রওনা হয়েছিল নতুন বাসভূমি খুঁজে নেবার আশায়। সাতদিন সাতরাত্রি বহু স্থান ও নদী পেরিয়ে সময় যে রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিল, সে দেশ এবং সেখানকার লোকজন দেখতে তুতকি রাজ্যের মতো মোটেও নয়। এ রাজ্য অনেক উন্নত-অনেক ধনী। তবু ফেলে আসা স্বদেশের জন্যে প্রাণ কাঁদে। তাই মাঝে মাঝেই ফিরে ফিরে আসে সময় নিজের জন্মভূমিতে। তিন তিনবার এসে তিন ভিন্ন রাজার রাজত্বে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তার। সে-সবেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হলো নিচে।

## এক

সেবার যখন সময় এলো, তখন দেশে গ্রীষ্মকাল। কাঠফাটা রোদ, তৃষ্ণার্ত কাক নিম গাছের ডালে বসে সারা দিন কা কা করে। আম কাঁঠালের গন্ধে চারদিক মো মো। দেশটার চেহারা আগের মতোই। অবিকল। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে কিছুর। হ্যাঁ, নতুন রাজা এসেছে দেশে। এ রাজা আবার অত্যন্ত বিপ্লবী। দেশকে রাতারাতি শিল্পায়িত করার দিকে ঝোঁক তার। আগের শোষক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজসিংহাসন জয় করেছে এ রাজা। জনগণ আদর করে তাকে তুতকিবন্ধু বলে ডাকে। কিন্তু রাজার চারপাশে মন্ত্রী-উজির-নাজির সাঙ্গপাঙ্গ প্রায় সকলেই নষ্ট প্রকৃতির লোক-ব্যভিচারী, অসাধু, অসৎ। শখ আর স্বপ্নে বিভোর রাজার সহজ সারল্যকে ব্যবহার করে তারা রাজভাণ্ডার ফতুর করতে শুরু করে। রাজাকে তারা বোঝায় এমন এক অসাধারণ কাপড় তৈরি করা হবে যা পরে বেরুলে সাত রাজ্যের লোক একত্রিত হয়ে রাজাকে দেখতে আসবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবী জুড়ে এ সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাপড়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। রাজার এবং রাজ্যের সমৃদ্ধির অন্ত থাকবে না। ফলে টাকা ঢালা হচ্ছে বিস্তর। যন্ত্রপাতি, সুতো সব কেনা শেষ। নির্ধারিত দিনে এক বুড়ো তাঁতিও এসে উপস্থিত। দিনরাত কাজ চলছে। কিন্তু একটাই শর্ত। এ কাপড় এতটাই মিহি, এতটাই সূক্ষ্ম যে কেবলমাত্র সৎ ও সত্যবাদী লোকই তা চোখে দেখতে পাবে– অন্যরা নয়। যেহেতু সকলেই সাধু সাজতে চায়– এমনকি রাজা নিজেও, কেউই মুখ ফুটে বলতে পারে না কাপড়টা চোখে দেখছে না তারা। রাজা নিজে অসৎ নয়– কিন্তু

যে কাপড় সবাই দেখতে পাচ্ছে, তা তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে যখন, নিশ্চয়ই সে কিছু পাপ করেছে। ছোটখাটো দু'একটি ত্রুটিবিচ্যুতি মনেও পড়ছে তার। অতএব, সকলের দেখাদেখি রাজাও তার দেশীয় শিল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একদিন কাপড় বোনা শেষ হয়। অবশেষে রাজাকে সেই মিহি কাপড় পরিয়ে যখন সভাস্থলে সকল প্রজার মাঝে হাজির করানো হলো, একটি তিন বছরের বাচ্চা ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, "এ কি? রাজা ন্যাংটো যে!" সঙ্গে সঙ্গে রাজার খেয়াল হলো, তাই তো তিন বছরের ছেলে তো অনাচারী মিথ্যেবাদী হতে পারে না। তাহলে এতদিন ধরে তার চারপাশের লোকেরা যা তাকে বুঝিয়েছে সবই মিথ্যে! অসহায়, বিব্রত, লজ্জিত রাজা চারদিকে তাকায় সহকর্মীদের আশায়। ততক্ষণে তার উজির, নাজির সাঙ্গপাঙ্গ ধনসম্পদ নিয়ে লা-পাত্তা। লজ্জা নিবারণের আর কোনো উপায় ছিল না রাজার। সর্বসম্মুখে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাঁকে।

সেদিন অনেক ভিড়ের মধ্যে সময়ও গিয়েছিল রাজদর্শনে।

## দুই

এবার দেশে এসে যা দেখল সময়, তার তা ছোটবেলায় শোনা এক রূপকথার কাহিনির সঙ্গে ভীষণভাবে মিলে যায়। গল্পটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা কিনা ঠিক মনে নেই সময়ের। তবে এটিও সেই সনাতন রূপকথার গল্প : সেই নির্ধারিত পুনরাবৃত্তি– দুর্জনের পরাজয়, সুজনের জয়।

গল্পটা অনেকটা এরকম। এক খাঁচাবন্দী বাঘ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃত্যুর দিন গুনছে। এমন সময় এক দয়ালু পথচারী যখন ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছেন, বাঘের হৃদয়বিদারক আবেদনে তাঁর মনে দয়ার সঞ্চার হয় এবং তিনি খাঁচাটি খুলে দেন। বাঘ কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসেই বলে, "এবার আমি তোমাকে খাব। খুব খিদে পেয়েছে।" লোকটি তো অবাক। বাঘের অকৃতজ্ঞতায় সেদিন বৃদ্ধের জীবনটা তখনই শেষ হয়ে যেত, যদি না তাৎক্ষণিক বুদ্ধিসম্পন্ন এক শেয়াল এসে উপস্থিত হতো সেখানে মধ্যস্থতা করার জন্যে। শেয়ালের কাছে গোটা ব্যাপারটার বিচার দেওয়া হলে, চালাক শেয়াল এমন ভাব দেখাতে লাগল যে সে ঘটনাটা কিছুতেই অনুসরণ করতে পারছে না– সবকিছু তালাগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যেন তার। ক্ষুধার্ত বাঘটি তখন অধৈর্য হয়ে প্রকৃত কী ঘটেছিল বোঝাবার জন্যে যেই খাঁচাটিতে পুনঃপ্রবেশ করেছে, প্রাজ্ঞ বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ শেয়াল তৎক্ষণাৎ খাঁচার দরজাটিকে বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে। বৃদ্ধ বেঁচে যায়। অকৃতজ্ঞের যোগ্য শাস্তি হয়।

কিন্তু এবার দেশে এসে সময় দেখে অনুরূপ একটি ঘটনা সেখানে ঘটলেও অকৃতজ্ঞ সেনাপতির যোগ্য শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে হয় না। সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের এক পর্যায়ে এই সেনাপতিকে কয়েকজন অসন্তুষ্ট তরুণ সৈন্য মিলে রাজদরবারেরই

এক কোণে বন্দী করে ফেলে। রাজাকে তো আগেই হত্যা করেছে তারা। সেনাপতির বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাহসী যোদ্ধা সহকারী সেনাপতি তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে কারাগার থেকে মৃত্যুভয়ে কাতর সেনাপতিকে উদ্ধার করে রাজার সিংহাসনে বসায়। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ও সন্দিহান নব্য রাজা প্রবল জনপ্রিয় ও কর্মঠ সহকারী সেনাপতির দ্বারা ভবিষ্যতে গদিচ্যুত হবার ভয়ে তাকে যারা কারারুদ্ধ করেছিল তাদের সঙ্গে একই কাতারে তার বিপদের বন্ধু প্রাণরক্ষাকারী সহকারী সেনাপতিকেও হত্যা করল। সমস্ত ঘটনাটা রূপকথার মতো শোনালেও শেষ মুহূর্তে প্রাজ্ঞ বিচারকের ভূমিকায় কেউ কিন্তু এগিয়ে আসে না রাজাকে এই অকৃতজ্ঞ ও নির্মম কাজ থেকে বিরত করতে। রাজা ততদিনে তার অনেক শত্রু সমালোচক ও বুদ্ধিদাতাকে নির্বিচারে হত্যা করে বা জেলবন্দি করে মহা খুশিতে নিজের খেয়ালখুশিমতো রাজত্ব করতে শুরু করেছে। দেশের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতি রোধ করে দেশকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঠেলে দিতে থাকে রাজা, যাতে জনসাধারণ তাদের দুর্ভোগের জন্যে রাজাকে দায়ী না করে। যেখানে সেখানে গাছ কেটে, দিঘি বানিয়ে দেশের বনসম্পদকে ধ্বংস করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে কৃষির উন্নতি ও আবাদি জমির বিস্তৃতির স্বপ্ন দেখে রাজা। দেশের অভ্যন্তরের সমস্যা সমাধান ও প্রতিবেশী রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চাইতে বহু দূরের রাজ্য ও ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মিতালি পাতাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। রাজ্যের মধ্যে গোপনে আবার অসন্তোষ বাড়তে থাকে। আর এর ফলে রাজার নিজের সেনাবাহিনীরই একাংশ যখন তাকে প্রকাশ্যে একদিন খুন করতে আসে, তাকে রক্ষা করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসে না। যে আসতে পারত, সেই পরম বন্ধুকে ক্ষমতার লোভে রাজা আগেই হত্যা করেছে। প্রাজ্ঞ বিচারকের আবির্ভাব না ঘটলেও তার নিজের লোকের কাছেই রাজা, শুধু তার রাজত্ব নয়, জীবনও হারায় নিজেরই লোভে-কৃতঘ্নতায়। সময় আবার তুতন রাজ্যে ফিরে যায়।

## তিন

তৃতীয়বার যখন এলো সময়, তখন শীতকাল। নরম আদুরে রোদ চারদিকে। শিশিরে ভেজা ঘাস। খেজুর গাছে তাজা রসের গন্ধে মৌমাছি ঘুরে বেড়ায়। এবার যে রাজা রাজত্ব করছে সে আবার ভীষণ লোভী আর অত্যাচারী। জনগণের সুখসুবিধে দেখার নাম করে শুধু নিজের পোশাকআশাক ধনসম্পদ বাড়াতে ব্যস্ত। এ রাজা আবার কবিও বটে। রাজরানি ছাড়াও তার বহু প্রেমিকা রাজ্যময় ছেয়ে আছে। অত্যন্ত সৌখিন প্রকৃতির এই রাজা কবিতা, ফুল আর নারীর প্রতি প্রগাঢ় মমতা বজায় রেখেও বাহ্যিক ধর্মাচরণে ব্যস্ত সর্বদা। ফলে তার পাপ ও অন্যায় কর্ম ঢেকে রাখার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। শুধু যে ঘুষ খেয়ে ও চুরি করে সে

ব্যক্তিগত অর্থ সঞ্চয় করে তা নয়, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে গেলে বা তার সমালোচনা করলে তাকে হয় মেরে ফেলে অথবা জেলে ঢুকিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে। ফলে দেশের জনগণ ভয়ে অস্থির। রাজার যাবতীয় কাজের তদারক ও পরামর্শের জন্যে রয়েছে যে ব্যক্তি, সে রাজ্যের প্রধান উজির। রাজার সকল কুকীর্তি সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। শুধু মেনে নেওয়া নয়– সে ব্যাপারে উৎসাহও দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, প্রথম প্রথম ছোটখাটো অন্যায় বা জোচ্চুরি করে রাজা যখন জানতে চাইত তার প্রতিক্রিয়া, এ উজির রাজাকে বোঝাতে সমর্থ হতো যে কেউ কিছু টের পাচ্ছে না। ওদিকে লোকজনের সকল অভিযোগ, রাজার যাবতীয় দুর্নাম খণ্ডন করে– অস্বীকার করে সে রাজার জয়গান করে বেড়ায়। অন্য উজির-নাজির দু'একবার রাজার মঙ্গল ও দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজাকে একটু-আধটু সতর্ক করে দেবার বা সৎ পরামর্শ দেবার চেষ্টা করলে এই প্রধান উজির তাদের দূর দূর করে হটিয়ে দেয় অথবা সোজা কারারুদ্ধ করে দেয়। রাজাকে সে বোঝায় এসব কিছু নয়– যা করছে রাজা ভালোই করছে। দেশবাসী কিছু টের পাচ্ছে না– কোনো অসন্তোষ নেই তাদের মাঝে। কিন্তু এভাবে অত্যাচারিত হয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না জনগণ। একদিন তারা বিদ্রোহ করে বসে। সেই শীতে সময় যখন দেশে এসেছে, তখন এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে একদিন জনগণ রাজাকে বন্দী করে ফেলে। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে যখন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, রাজা শেষবারের মতো তার প্রধান উজিরের সঙ্গে একটা কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাজাকে উজিরের কাছে নিয়ে গেলে তার কানে কানে কিছু বলবে এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে যেই উজির তার কানটি এগিয়ে নিয়ে এলো রাজার মুখের কাছে, ওমনি কচ করে প্রধান উজিরের কানখানা কেটে দিল রাজা তার হাতের ছুরিটি দিয়ে। তারপর হেসে বলল, "এতদিন ধরে লোকজনের এত অভিযোগ শুনেও না শোনার ভান করে সব স্বাভাবিক আছে বলে আমার যে বিশাল ক্ষতি তুমি করলে, তার জন্যে এই কানটি কেটে নিলাম তোমার।"

রাজা কারারুদ্ধ হয়। রাজত্ব পাল্টায়। লোকজনের দুঃখ কমে না। সময় পুনরায় তুতন রাজ্য অভিমুখে রওনা হয়।

## চার

শেষবার যখন সময় আবার স্বদেশে এলো সেটা আরেক শীত। এবার দেশের রাজা প্রতিনিয়ত নিজেকে জনদরদি বলে প্রচার করে বেড়ায়। কেননা রাজত্বটি সে ছিনিয়ে নেয়নি। জনগণই তাকে রাজা বানিয়েছে। দেশের দারিদ্র্য-বেকারত্ব, দলীয় পক্ষপাতিত্ব, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি নানান কারণে লোকজনের মধ্যে রেষারেষি,

অবিশ্বাস খুব বেড়ে গেছে। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মতানৈক্য-ঝগড়া-মারামারি। রাজা নিজের গদি পোক্ত রাখতে এই গোষ্ঠীগত বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের অবসান চায় না। ওরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করলে আমাকে ঘাঁটাবে না, এমন একটা যুক্তি কাজ করছে মনে। তাছাড়া রাজার ধারণা এ রাজ্যে একটি গোষ্ঠী তার কার্যকলাপ ঠিক পছন্দ করে না– সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প তারা। দুই গোষ্ঠীতে ঝগড়া-মারামারি করে এই বিরোধী গোষ্ঠীর কিছু লোক যদি দেশ ছেড়ে চলে যায়, রাজার জনপ্রিয়তার জন্য সেটা লাভজনকই হবে। ফলে এ অশান্তি নিরসন করার দিকে কোনো লক্ষ নেই রাজার। এদিকে বৃহদাকার গোষ্ঠী ক্ষুদ্রাকার গোষ্ঠীকে সম্পত্তির লোভে কুক্ষিগত করে ফেলেছে, তাদের জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। বাইরের জগতে দেশের এই হানাহানি ও অত্যাচরের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের দুর্নামে রাজা খুবই বিচলিত। অবশেষে সে একদিন ঠিক করে কিছু ক্ষমতাশালী বড়ো বড়ো দেশের নেতাদের নিয়ে দেশের ক্ষুদ্রাকার গোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে তদারক করতে বেরুবে। উদ্দেশ্য, বহির্বিশ্বে জানানো যে, দেশের ভেতরকার হানাহানির বিষয়ে সব সংবাদই মিথ্যে। রাজদরবার থেকে আগেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে– দেশে গোষ্ঠীগত সদ্ভাব বজায় রয়েছে এ কথা প্রকাশ করলে মহারাজা খুশি হয়ে লোকজনকে পুরস্কৃত করবে। ফলে সকলে যেন আশানুরূপ ব্যবহার করে। অন্যথায় তাদের ভাগ্যে কী জুটতে পারে তাও পরোক্ষে বোঝাতে কার্পণ্য করে না রাজসিপাহি।

রাজা তার বিদেশি সম্মানী অতিথিদের নিয়ে প্রথমে দেশের উত্তরের দিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনে গেল। একজন অনাহারী ক্ষুদ্রাকার গোষ্ঠীর মহিলাকে রাজা জিজ্ঞেস করল–

"আপনার বাবা কে?"

"আপনি মহারাজ।"

"আর আপনার মা?"

"আপনার রাজত্ব মহারাজ।"

"এখানে আপনাদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে স্প্রীতি কেমন? কোনো গোলমাল নেই তো?"

"না, মহারাজ। খুব সদ্ভাব আমাদের। দারুণ সম্প্রীতি।"

"কী চান আপনি?

'পঞ্চাশ মন চাল মহারাজ, যাতে ছেলেপুলে নিয়ে অনেকদিন পেট পুরে খেতে পারি।"

রাজা ৫০ মন চালের ব্যবস্থা করল মহিলার জন্য।

এবার রাজা গেল দলবল নিয়ে দেশের মধ্যম অঞ্চলে। এক যুবককে ধরল রাস্তায়। সেও ক্ষুদ্রাকার গোষ্ঠীর লোক, নাম শুনেই বুঝতে পারল রাজা।

"তোমার বাবা কে?"

"আপনি মহারাজ।"

"আর মা!"

"আপনার রাজত্ব।"

"এখানে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সম্প্রীতি কী রকম?"

"খুব ভালো মহারাজ। কোনো অসুবিধে নেই।"

"তুমি কী চাও?"

"একটা ভালো চাকরি। অনেক পড়াশুনা করেও কোনোদিন মনমতো একটা চাকরি পাইনি।"

রাজা একটি ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় ছেলেটির জন্য।

রাজা তার বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে এবার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি দ্বীপে এসে দাঁড়ায়। সেখানে ক্ষুদ্রাকার গোষ্ঠী পরিবৃত অঞ্চলের এক অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয় তাদের। রাজা জিজ্ঞেস করে, "আপনার বাবা কে?"

"আপনি মহারাজ।"

"আর মা?"

"আপনার রাজত্ব মহারাজ।"

"এখানে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সম্প্রীতি কী রকম?"

"এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।"

"আপনি কী চান?"

"সত্য কথা বলার অধিকার মহারাজ। যা দেখি, যা শুনি, যা বুঝি শুধু সেটুকু যদি বলতে দেন নির্ভয়ে আর কিছুই চাইব না।"

রাজা অতিথিদের একটু দূরে রেখে উজিরকে নিচু গলায় নির্দেশ দিল বুড়োটিকে কারাগারে পুরে দিতে। দেশ ছেড়ে সময় আবার তুতন রাজ্য অভিমুখে রওনা হলো। মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ এবারও তার একক চলার সঙ্গী ও সাক্ষী হয়ে রইল।

# আত্মরক্ষার দশ উপকরণ

সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা। অতএব, বয়োবৃদ্ধ দম্পতি সন্তানদের কাছে ডাকিলেন।

তিন পুত্র। সময়। নিলয়। আলয়।

বৃদ্ধ কহিলেন, "জীবনভর তোমাদের কেবল বিদ্যা অর্জন করিতেই উৎসাহ দিয়াছি। আর দিয়াছি উপদেশ– সাহিত্য, শিল্প আর সঙ্গীতের মাধুর্য গ্রহণ করিতে। জীবনকে সুন্দর করিবার ব্যাপারে শিক্ষা দিলেও জীবন রক্ষার পদ্ধতি তোমাদের কখনো শিখাই নাই। তাই তোমরা না পার দৌড়াইতে, না পার সাঁতার, না বৃক্ষে আরোহণ, যেগুলোকে মানুষের স্বভাবগত গুণ বলিয়াই অনেকে মনে করে। আজ যাইবার সময় মনে হইতেছে এই বৈরী পরিবেশে তোমাদের যদি আত্মরক্ষার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ শিক্ষাও না দিয়া যাই, পরপারে গিয়াও শান্তি পাইব না। হাতে সময় খুবই অল্প। ফলে তোমাদের প্রত্যেককে মাত্র একটি করিয়া পদ্ধতি শিখাইয়া যাইব।"

পিতামাতার আদেশে প্রথমে শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল আলয়। মাতাপিতা কহিলেন, "তুমি উত্তম করিয়া সাঁতারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। এত দ্রুত, এত রকম বিভিন্ন মুদ্রায় সন্তরণে পারদর্শী হইবে যে কাহারও সাধ্য হইবে না তোমাকে হার মানাইতে।"

আলয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অচিরেই রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল। ইহার পর কাছে আসিল নিলয়।

মাতাপিতা কহিলেন, "তুমি বৃক্ষ আরোহণে এমন পারঙ্গমতা অর্জন করিবে যে কাঠবিড়ালি অপেক্ষাও দ্রুত ও সহজভাবে বৃক্ষে চড়িতে পারিবে; সে-বৃক্ষ কণ্টকে পরিপূর্ণ হউক, শাখাহীন তৈলাক্ত পিচ্ছিল হউক, অথবা বিশাল চওড়া কাণ্ডেরই হউক। অনেক উঁচুতে, এত দ্রুত উঠিয়া যাইবে যে কাহারও সাধ্য হইবে না তোমার নাগাল পাইবার।"

নিলয় কাঠবিড়ালির মতো দ্রুত গতিতে বৃক্ষ আরোহণে পারদর্শিতা অর্জন করিল। ইহার পর কাছে ডাকা হইল সময়কে।

মাতাপিতা কহিলেন, "যাও, তুমি এখন হইতে দৌড়াইতে শুরু কর। পিছনের দিকে না তাকাইয়া প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে আগাইয়া যাও। এত জোরে তুমি ছুটিবে যে পৃথিবীর দ্রুততম ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

পিতামাতার আদেশে সময় দৌড়াইতে শুরু করিল এবং অচিরেই শ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী বলিয়া পরিচিতি লাভ করিল।

পিতামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহাদের অন্তিম আশঙ্কা বাস্তব রূপ গ্রহণ করিল। অকস্মাৎ একদিন তিন সহোদর আবিষ্কার করিল তাহারা সত্য সত্যই আক্রান্ত, স্বদেশী প্রতিপক্ষ অসীম বলবান-সশস্ত্র। যাবতীয় সমর-সরঞ্জামে সজ্জিত। এদিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র যুদ্ধবিমুখ তিন সহোদর। আক্রান্ত হইবার মতো কোনো অপরাধ তাহাদের দ্বারা সংগঠিত হয় নাই। কাহারও কোনো ক্ষতিও কখনো করে নাই যাহার জন্য কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতে পারে। কিন্তু তবু তাহাদের উপর আক্রমণ আসিল। ভ্রাতৃত্রয় পিতামাতার প্রদত্ত আত্মরক্ষার উপদেশ মানিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। নবলব্ধ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে গিয়া প্রত্যেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হইল।

আলয়, যে সাঁতার কাটিতে অত্যন্ত পারঙ্গম, তাহাকে ধাওয়া করিয়া লইয়া আসা হইল গভীর এক জঙ্গলে। জলাশয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলে তাহাকে ছুঁইবার কাহারো ক্ষমতা থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যেই স্থানে আত্মরক্ষার পরীক্ষায় তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইল, সেইখানে তাহার চারিপাশে কেবল বৃক্ষরাজি, জলের চিহ্নমাত্রও নাই। আলয় সময়ের মতো দ্রুত ছুটিতে পারে না। এদিকে আক্রমণকারীরা তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিবে। উপায় না দেখিয়া মরিয়া হইয়া আলয় সম্মুখের একটি বৃক্ষে আরোহণের চেষ্টা করে। এই প্রথম বৃক্ষে চড়িবার প্রচেষ্টা। আলয় জানে ইহা একটি অর্জিত ক্ষমতা। হঠাৎ করিয়া একদিন কেহ বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে না। কিন্তু নিজেকে বিস্মিত করিয়া আলয় আবিষ্কার করিল, তরতর করিয়া সে সুউচ্চ কাণ্ডের সুবিশাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নিজেকে বৃক্ষপত্রাবলির আড়ালে সম্পূর্ণ লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল। আক্রমণকারীরা জঙ্গলের চারিপাশে তাহাকে ব্যর্থভাবে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিলয়, যে বৃক্ষ আরোহণে পারদর্শী, তাহাকে ধাওয়া করিয়া যেইখানে লইয়া যাওয়া হইল, সেইস্থান বিশাল এক নদীর তীরে। সম্মুখের নদী দিগন্তবিস্তারী বিরাট বিরাট ঢেউ অনবরত প্রচণ্ড শোঁ শোঁ গর্জনে ভাঙিয়া পড়িতেছে। পিছনে হটিয়া যাইবার কোনো উপায় নেই। চারিপাশে কোনো বৃক্ষরাজি দেখিতে পায় না নিলয়। তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এমন একটা বোধ তাহাকে পঙ্গু ও অবশ করিয়া দিতে চায়। নিলয় বোঝে মৃত্যু অথবা আত্মসমর্পণের বিকল্প কেবল এই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়া। কিন্তু সে যে সাঁতার জানে না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণের অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া নিলয় চোখ বুজিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পর ক্রমাগত হাত পা ছুঁড়িয়া নিজেকে কোনোমতে ভাসাইয়া

রাখিতে চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ পরই নিলয় আবিষ্কার করিল সে দিব্যি সাঁতার কাটিতেছে। শুধু ভাসিয়া বা জলের উপর গা এলাইয়া দিয়া নয়, ডুব দিয়া চিৎ হইয়া নানান ভঙ্গিতে দিব্যি সে নদীর মধ্যস্থলে চলিয়া যাইতেছে। আক্রমণকারীরা স্তম্ভিত হইয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া থাকে।

এদিকে যাহারা সময়কে আক্রমণ করিতে আসিল তাহারা তাহাকে ছুটাইতে ছুটাইতে লইয়া আসিল বিশাল এক মাঠে। দ্রুততম গতিতে দৌড়াইতে পারঙ্গম সময় ছুটিতে গিয়া আবিষ্কার করিল তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। যেইদিকে যত দ্রুত সে চলিবে সেইদিকে তত দ্রুত সে ধরা পড়িবে। আক্রমণকারীদের বৃত্ত ততক্ষণে ছোট হইতে শুরু করিয়াছে। মধ্যখানে দাঁড়াইয়া সময় বুঝিতে পারিল তাহার অর্জিত সম্পদ দ্রুত ছুটিয়া চলা– এই মুহূর্তে মূল্যহীন। আশেপাশে কোনো জলাশয় বা বৃক্ষরাজিরও দেখা নাই। হঠাৎ ছোটবেলার একটি স্বপ্নের কথা তাহার মনে হইল। স্বপ্ন দেখিত আকাশে উড়িতে পারে সে। হাওয়ার উপর ভর করিয়া সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে সে আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। পা ছুঁড়িলেই সে আরও উপরে উঠিয়া যায়। আবার মাথা নিচু করিয়া ডিগবাজি দিয়া নিচে নামিয়া আসে। যেন শূন্যে চলাচল তাহার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সময়কে ততক্ষণে আক্রমণকারীরা প্রায় ধরিয়া ফেলিতেছে। উপায় না দেখিয়া সময় দুই পা দিয়া মাটিতে লাথি মারিবার ভঙ্গি করিয়া শুন্যে উঠিতে চেষ্টা করিল। একবার দুইবার বিফল হইবার পর সে আবিষ্কার করিল সে আস্তে আস্তে শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে। যতই পায়ে চাপ দিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে ততই উপরে উঠিয়া যায় সে। অনেক উপরে উঠিয়া সে আনুলম্বিক ভঙ্গি পরিবর্তন করিয়া সমান্তরালভাবে নিজেকে হাওয়ার উপর বিছাইয়া দিয়া মাটির দিকে তাকায়। লক্ষ করে আক্রমণকারীরা সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহাকেই অবলোকন করিতেছে। সময় অবলীলায় শূন্যে ভাসিয়া বেড়ায়।

এদিকে বৃক্ষে আরূঢ় আলয়ের দিন যাইতে রাত আসে। রাত ভোর হইলে আবার দিন। গাছের উপর বাস করে যে বানর সে তাহাকে কলা, কমলা আনিয়া খাওয়ায়। শাখা ও পাতার আচ্ছাদন তৈরি করিয়া বৃক্ষ তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে রক্ষা করে। শিকড় হইতে টানিয়া আনা পুষ্টিকর রস পুরু পত্রাবলি ও ফলের মধ্যে দিয়া অতিথিকে পরিবেশন করিয়া তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

তৃতীয় দিন বৃক্ষ বলে, "এইবার তো তোমাকে লোকালয়ে ফিরিতে হয়"। আলয় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে।

"না, না, সেইখানে ফিরিয়া গেলে আমাকে উহারা মারিয়া ফেলিবে। তোমরা দয়া করিয়া এইখানেই আমাকে থাকিতে দাও।"

বৃক্ষ হাসিয়া কহিল, "তাহা হয় না। তোমরা আনুলম্বিক জীব। দুই পায়ে ভর দিয়া চল। তোমাদের বিশ্রাম গাছের ডালে সম্ভব নয়। সমান্তরালভাবে শুইয়া, হাত-পা ছড়াইয়া মেরুদণ্ড চিত করিয়া বিশ্রাম লইতে হয় তোমাদের। বিশ্রাম ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নয়। অতএব, তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

বানর কহিল, 'ইহা ছাড়া তোমার একাকিত্ব মোচন ও শারীরিক প্রয়োজনেও নারীসঙ্গ দরকার। তোমাকে লোকালয়ে ফিরিতেই হইবে।"

আলয় কহিল, "পিতামাতা জীবন রক্ষার জন্য যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট নয়। তোমরা তাহা হইলে তোমাদের জীবন আহৃত সত্য হইতে আরও কিছু আমাকে শিখাইয়া দাও, তাহা দিয়া আমি বাঁচিয়া থাকার শক্তি যোগাড় করিতে সমর্থ হইব।"

বানর কহিল, "বেশ, একটা কথা মনে রাখিবে। যখন তুমি আক্রান্ত হইবে, প্রতিরক্ষা বা পাল্টা যুদ্ধ করার চেষ্টা তখনই করিবে যখন প্রতিপক্ষ সমানসমান বা একটু বেশি শক্তিশালী। অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর বা বেশি শক্তিধর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার চেষ্টা বোকামি। সেইখানে মৃতের অভিনয় করাই ভালো। শক্তিশালী পশু সাধারণত মৃত কোনো শিকার স্পর্শ করে না। তাহারা জীবন্ত শিকার জয় করিতে চায়। তোমাকে আমি শিখাইয়া দিতেছি কীভাবে না মরিয়াও মরার ভান করিতে পার।" এই বলিয়া বানর আলয়কে মৃতের অভিনয় শিখাইল।

বৃক্ষ কহিল, "আমার জীবন হইতে আহৃত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে তোমাকে এই শিক্ষাই দিই যে, তুমি কখনো পা হইতে মাথা পর্যন্ত শুধুই নিজের শারীরিক ও বাহ্যিক অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ থাকিও না। এই যে তোমরা আমাকে দেখিতেছ, আমার বিশাল কাণ্ড, ডালপালা আর কিছু পাতা, ইহাকেই তোমরা আমার সামগ্রিক পরিচিতি বলিয়া মনে কর। অথচ আমি জানি, আমি ইহার চাইতে অনেক বড়ো। মাটির নিচে এবং শূন্যে দুই দিকেই, যাহার সবটা তোমরা দেখিতে পাও না। তোমরা মনে কর আমি স্থবির– এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। অথচ আমি এত উঁচুতে অবস্থান করি যে, এক জায়গায় দাঁড়াইয়াও চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে পারি। আমি চাই অনুরূপভাবে তোমার শিকড় নিজ ভূমিতে নিজ সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত থাকিবে। অথচ তোমার মস্তিষ্ক, তোমার কান, চক্ষু অনেক উঁচুতে বিশাল দিগন্তে প্রসারিত হইবে। যেইখান হইতে জ্ঞানার্জন করিয়া নিজেকে আরও শক্তিধর করিতে পারিবে। আর পৃথিবীর বিশালত্ব অনুধাবন করিয়া প্রয়োজনে নিজেকে আরও ছাড়াইয়া দিতে কার্পণ্য করিবে না।"

বানর ও বৃক্ষ হইতে আহৃত প্রজ্ঞা লইয়া আলয় গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে নিলয়েরও দুই দিন প্রায় কাটিয়া যায় নদীতে। কখনো নদীর উপর ভাসিয়া, কখনো জলের গভীর অতলে নিমজ্জিত হইয়া। নদী কোথা হইতে লম্বা নলখাগড়া যোগাড় করিয়া লইয়া আসিয়াছে নিলয়ের জন্য। যখনই সে জলের নিচে থাকে, নদীর উপরে শূন্যে দণ্ডায়মান নলখাগড়ার অন্য প্রান্ত দিয়া জলের নিচ হইতে সে শ্বাস গ্রহণ করে। তৃষ্ণায় বারি। মাছেরা দল বাঁধিয়া তাহাকে শালুক, শাপলা, হেলাঞ্চি নানা রকমের খাবার আনিয়া নেয়। দুইদিন পর নদী কহে, "এইবার তো তোমাকে ঘরে ফিরিতে হয়।"

নিলয় শঙ্কিত হইয়া পড়ে, "না, না, আমি এইখানেই থাকিব। ঘরে ফিরিয়া গেলে আমার জীবন বিপন্ন হইবে।"

নদী বলে, "কিন্তু তুমি যে এখানে বেশি দিন থাকিতে পারিবে না। জলের নিচে তোমার থাকার উপায় নেই। যে পরিমাণ বায়ু-অক্সিজেন প্রয়োজন তোমার, তাহা আমরা বেশিক্ষণের জন্য সরবরাহ করিতে পারিব না। অতএব, তোমাকে লোকালয়ে ফিরিতেই হইবে।"

মৎস্য কহিল, "তাহা ছাড়া তোমার সঙ্গলাভ ও দৈহিক আনন্দের জন্য একজন নারী প্রয়োজন। লোকালয়ে তোমাকে ফিরিতেই হইবে।"

নিলয় তখন বলে, "পিতামাতার প্রদত্ত জীবনরক্ষার পদ্ধতি যথেষ্ট নয় বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা তাহা হইলে নিজেদের জীবনে অর্জিত শিক্ষা হইতে আমাকে কিছু জ্ঞান দাও, যাহা দিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।"

মৎস্য কহিল, "বেশ, এই নদীর নিচে হরেক রকম কত মৎস্য দেখিতে পাও, হয়ত ভাব কত আনন্দে আছি আমরা, কত শান্তিতে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরাও তো প্রতিনিয়ত জীবনের ভয় করি। বড়ো মাছেরা আমাদের মতো ছোট মাছকে সব সময়ই গিলিতে চায়। আমরা অনেক চালাকি করিয়া বাঁচিয়া থাকি। যখন শত্রুপক্ষ বা প্রতিপক্ষ অতি বড়ো, অতি শক্তিশালী তখন সরাসরি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই। অন্যভাবে তাহাদের মোকাবেলা করিতে হয়। এই দেখ, আমরা যত ছোট, তত সুন্দর তত রঙবেরঙের অধিকারী। যখন প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারিবে তখন অন্যভাবে তাহার মন জয় করিবার চেষ্টা করিবে। রূপ, গুণ, কলাকৌশল দিয়া। তোমাদের মানুষদের তো সেই সব গুণাবলির অভাব নাই শুনিয়াছি।"

জল কহিল, "যখন তুমি আক্রান্ত এবং প্রবলভাবে আক্রান্ত অতি প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের কাছে, তখন নিজের অস্তিত্ব, নিজের বিশ্বাসকে নতুনভাবে প্রচার করিবার, প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন নাই। তখন আমার কথা মনে করিবে। রংহীন,

বর্ণহীন, আকারহীন, স্বাদহীন একটি তরল পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু অবশ্যই কেবল এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য। এই বিশেষ সময়টাতেই সেইরকম হইবে। অন্য সময়ও যদি তুমি তাই হও, তাহা হইলে আর মানুষ থাকিবে না। পুরোপুরি জলেই পরিণত হইয়া যাইবে।"

মৎস্য ও জল হইতে প্রজ্ঞা আহরণ করিয়া নিলয় গৃহ অভিমুখে রওনা হইল।

শূন্যে ভাসিয়া বেড়ানো সময়ের চোখের সামনে দিন কাটিয়া রাত আসে। আবার দিন। রৌদ্রে ক্লান্ত সময়কে আকাশ সাদা মেঘ আনিয়া ছায়া দেয়, পিপাসায় বারি বর্ষণ করে। রাতে সহস্র নক্ষত্র-আলোকিত দিগন্তে সময় নিরুদ্দিষ্ট ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে লোকালয়ের দিকে তাকায়, লোকের ঘরে ফেরা দেখে– প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততা-ছোটাছুটি। একটি বিশাল পক্ষী সময়ের পাশে পাশে উড়িয়া বেড়ায়। ভালো করিয়া উড়িবার কয়েকটি পদ্ধতি শিখায় তাহাকে। দুই বাহু সামনের দিকের পরিবর্তে দুই পাশে আড়াআড়িভাবে রাখিয়া সাঁতার কাটার ভঙ্গি করিলে আরও আরামে, আরও আয়াশে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে আলয়। খাবারের ছোট ছোট টুকরা কোথায় হইতে ঠোঁটে করিয়া আনিয়া সময়কে খাওয়ায় পক্ষী। সময় ভাসিয়া বেড়ায়। শূন্যে।

তৃতীয় দিন আকাশ কহে, "এইবার তো তোমাকে লোকালয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়।" সময় ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠে। "না, না, সেখানে ফিরিয়া গেলে আমি আর বাঁচিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে দাও।"

আকাশ কহে, "কিন্তু এইখানে এই ভাবে কীভাবে চলিবে তুমি? তোমার খাদ্য দরকার। শূন্যে খাবার জুটিবে না। পক্ষীর ঠোঁটে করিয়া আনা শস্যদানায় তোমার উদরপূর্তি হইবে না। তোমাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতেই হইবে।"

পক্ষী কহিল, "তাহা ছাড়া তোমার যৌন অনুভূতিসহ অন্য সবরকম আবেগ অনুভূতির অংশীদার করিবার জন্য নারীসঙ্গ প্রয়োজন। ফলে লোকালয়ে ফিরিতে হইবে তোমাকে।"

সময় বলে, "পিতামাতার দেওয়া শিক্ষা জীবনরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। তোমরা তাহা হইলে তোমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আরও কিছু শিখাইয়া দাও যাহা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব।"

পক্ষী কহিল, "বেশ তো। তুমি তোমার খুশিমতো যেইদিকে সঠিক মনে কর সেইদিকেই চলিবে যেমন আমি চলি। হাওয়া উল্টাদিকে বহিতেছে বলিয়াই সব সময় সহজ উপায় হিসেবে উল্টা দিকেই চলিতে হইবে, তেমন কথা নাই। কিন্তু বন্ধু, যদি কখনো ঝড় উঠে, প্রচণ্ড বেগে একদিকে হাওয়া ছোটে, তখন তোমার গন্তব্য বা যাত্রাপথ অন্যদিকে হইলেও তুমি কিন্তু সেইদিকে তখন যাইও না।

আমরা যাহা করি, সেই জরুরি পরিস্থিতিতে ঝড় যেইদিকে বহিতেছে, সেইদিকেই আপাতাভাবে নিজেকে উড়াইতে দিই খানিকক্ষণ, উল্টাদিকে গেলে যেহেতু মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইব। তাহার পর সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া থামিয়া যাই, অথবা পরে নিজের ইচ্ছামতো দিক পরিবর্তন করি।"

আকাশ বলিল, "শূন্যে এত উঁচুতে থাকিয়া যে লাভ হইয়াছে আমার এবং আশা করি তোমারও তাহা হইল, এই জগৎটা যে কত বড়, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা হইয়াছে। দেশ, মহাদেশ, কোনোকিছুর কোনো সীমান্ত বা সীমাবদ্ধতা নাই। অসীম এক দিগন্তে স্বাধীন সত্তা তুমি। যদি আক্রান্ত হও কখনো, নিরাপদ বোধ না কর গৃহকোণে, বাহির হইয়া পড়িবে। এত বড়ো বিশ্বে জায়গার অভাব?"

পক্ষী ও আকাশ হইতে প্রজ্ঞা আহরণ করিয়া সময় গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিল।

মাঘী পূর্ণিমার গোলাকার চাঁদ আজও আকাশে একাকী। পুরনো পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িটিতে একে একে আবার আসিয়া উপস্থিত হয়–

সময়।

আলয়।

নিলয়।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আহৃত প্রজ্ঞার কথা বলিয়া অতঃপর প্রয়োজনীয় সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাহারা। এখন আত্মরক্ষার জন্য শুধু একটি পদ্ধতি নয়, প্রত্যেকেই দশটি উপায় জানে। যথা–

১. সাঁতার
২. বৃক্ষ আরোহণ
৩. দৌড়ানো
৪. আকাশে উড্ডয়ন
৫. মৃতের অভিনয়
৬. মাটির গভীরে প্রোথিত হইয়াও আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ
৭. চিত্তাকর্ষক রূপ ও কলার প্রয়োগে মনোজয়
৮. রংহীন, আকারহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন তরল পদার্থে রূপান্তর
৯. ঝড়ের বিপরীত ছুটিতে না যাওয়া
১০. অসীম দিগন্তে, সীমান্তহীন ভূমিখণ্ডে, বৃহত্তর পৃথিবীতে নিজেকে আবিষ্কার।

আত্মরক্ষার এমন মোক্ষম জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পর কাহার সাধ্য তাহাদের ধ্বংস করিবে! অতএব, পরম নিশ্চিন্তে তিন সহোদর ঘরে ফেরে।

প্রথম রাত্রি শান্তিতেই কাটে।

দ্বিতীয় রাত্রে উৎকণ্ঠা। উত্তেজনা চারিদিকে।

তৃতীয় রাত্রে যে বসতবাড়িতে নিদ্রামগ্ন ছিল তিন সহোদর, তাহার চারিপাশে আগুনের শিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

সোজা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে আপন শাখা ও পত্রাবলি ছড়াইয়া দিয়া বৃক্ষ হাওয়াকে বাধা দেয়, যাহাতে অগ্নির লেলিহান শিখা বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে। বিন্দু বিন্দু সংগৃহীত বাষ্প হইতে আকাশ ঝুরঝুর করিয়া বৃষ্টি ঝরায় অগ্নি নির্বাপণের আশায়। দুই কূল প্লাবিত করিয়া নদী ছুটিয়া আসে লোকালয়ে, তুতকি রাজ্যে। সর্বগ্রাসী প্রচণ্ড উত্তাপে জলের বড়ো প্রয়োজন এখন।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষের কাণ্ডে বসিয়া বানর, অসীম আকাশে উড়ন্ত পক্ষী আর বন্যার জলে ভাসিয়া আসা ছোট্ট মৎস্য বিস্ময়ে লক্ষ করে আরও একটি আত্মরক্ষার পদ্ধতি আয়ত্ত করিবার অক্ষমতায় কেমন অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্যে জ্বল জ্বল করিতেছে তিনটি মনুষ্যপ্রাণী।

# জীবনবৃক্ষে রিপু-রঙ

**ভয়/আতঙ্ক :** ১৯৬৪ সালের শীতকাল। মুন্সীগঞ্জ শহর। কাশ্মীরের হযরতবাল দরগায় সংঘটিত এক কুখ্যাত, স্পর্শকাতর চুরিকে কেন্দ্র করে চারদিকে তখন প্রবল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, খুনোখুনি। গত কয়েক দিন ধরে নানান ধরনের গুঞ্জন, বিভিন্ন রকম গুজব কানে আসছে। ফলশ্রুতিতে মিলিত কণ্ঠে, "নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর" শোনার আশঙ্কায় প্রতি রাতেই আমরা ভয়ে ভয়ে কান পেতে বসে থাকি ঘরের ভেতর। যে ধ্বনি এত পূতপবিত্র, যে শব্দোচ্চারণ সৃষ্টিকর্তার মহিমা ঘোষণা করে কেবল, তার প্রতি এত আতঙ্ক কেন? কেননা, সময়টা ১৯৬৪ সাল, আর আমাদের বসতি ভারত উপ-মহাদেশেরই একাংশে যা বহুকাল ধরে বিক্রমপুর বলে পরিচিত। হঠাৎ এক রাত্রে সত্যি সত্যি সেই প্রাণকাঁপানো, গলা শুকিয়ে দেওয়া, পরিচিত শব্দাবলি কানে ভেসে আসে। একে একে মনোযোগ দিয়ে বাড়ির প্রত্যেকেই শুনি আমরা, সেই মহারব। তাই তো। নিঃসন্দেহে নদীর ধার থেকেই আসছে সমস্বরে উচ্চারিত ঐ ধ্বনি। একযোগে, সুর করে, পুনঃপুন "নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর"। এবার আর রক্ষা নেই। কী করবো, কোথায় যাবো এখন আমরা? এত রাতে। ভাইবানেরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে মশারির ভেতরে বসে কাঁপতে থাকি। হঠাৎ মা আবিষ্কার করেন এবং কিছুক্ষণ পাশের ঘরে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হন, ঘুমন্ত ঠাকুরমার ধীর লয়ের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নির্দিষ্ট এক ছন্দে নাসিকা গর্জনের মাধ্যমে গভীর খাদে যে গোলমালের মতো এক শব্দ সৃষ্টি করছে, তা-ই এই ঘরে নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর-এর জন্ম দিচ্ছে, অন্তত আমাদের ভীত মনে, সন্ত্রস্ত কানে অবিকল তাই শোনাচ্ছিল সেই রাতে। মায়ের আবিষ্কারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি আমরা। ছোট ভাই দুলাল কেবল এতক্ষণে বলে ওঠে, তাই তো বলি, দূর থেকে আসা গুঞ্জনটা এতক্ষণ ধরে এক জায়গাতেই থেমে আছে কেন? আর যেন কাছে এগুচ্ছে না।

**কাম/সম্ভোগ :** তার সঙ্গে রতিক্রিয়ায় যে-আনন্দ, যে-সুখ কখনো পাই না, আমার পাশ দিয়ে অন্য মানুষটির নিছক হেঁটে চলে যাওয়া, তার মুখের বিরল দু'চারটে শব্দোচ্চারণ, আমার চোখে চোখ রেখে সামান্য স্মিত হাসি, কিংবা তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আলতো একটুখানি ছোঁয়া তার চেয়ে বহুগুণ শিহরণ জাগায় শরীরে-মনে; পুলকিত হয়ে উঠি আমি– সিক্ত হয়ে ওঠে আমার অন্তর্গত বসন।

**হিংসা/পরশ্রীকাতরতা :** মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়হীন সুনীল আকাশ মাথায় নিয়ে কাকভোর হলে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রতিদিনের মতো আজও কাচের জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকাই। দেখি, চারদিকে দেয়াল ঘেরা আমার শখের বাগানের অপরূপ শোভা, সবচেয়ে আকর্ষণীয় টকটকে লাল রঙের ওপর হলুদ ছোপ ছোপ বৃহৎ, নিটোল আর উজ্জ্বল টিউলিপটা, ভেঙে দিয়ে গেছে কেউ। শুধু ভেঙে দিয়ে গেছে বললে ভুল বলা হয়। মূল গাছটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গেছে ফুলসহ লম্বা ডগাটিকে, একেবারে গোড়া থেকে। মৃত সেনাপতির ঈর্ষণীয় দেহাবশেষ মাটিতে টান টান শুয়ে আছে যেন। ঘাসের ওপর পড়ে আছে ডগাসহ একহারা দীর্ঘাঙ্গী আধফোটা টিউলিপটি, যার লাল টুকটুকে শরীরের ভেতর হলদে ছিটাগুলো এখনও স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে।

**ক্রোধি/ রোষ :** জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিছানায় বসে মেয়েটি অতঃপর একটি ধারালো ছুরি দিয়ে তার সঙ্গীর পুরুষাঙ্গ কেটে রক্তাক্ত বস্তুটা দুই আঙ্গুলে ধরে এমন অবলীলায় ছুড়ে ফেলে দেয় জানালার বাইরে, মনে হয়, যেন ঐ বিশেষ প্রত্যঙ্গটি এর আগে আর কখনো চোখে দেখেনি সে, কখনো স্পর্শ করেনি। যেন একতাল গোবর অথবা কোনো অবাঞ্ছিত পোকামাকড় এসে পড়েছিল হাতের আঙ্গুলে। কোনোমতে টোকা দেবার ভঙ্গিতে দুই আঙ্গুল ঝেড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন– দূরে।

**লোভ/লালসা :** নেমন্তন্ন খাওয়া শেষ হলে খাঁটি রুপার তৈরি চামচ দু'খানি কোলের ওপর বিছানো ভারী কাপড়ের ন্যাপকিনে ভালো করে মুছে নিয়ে আস্তে নিজের কোটের পকেটে পুরে দিই, সবার অলক্ষ্যে। মনে মনে বলি, নিজেকে সান্ত্বনা দিই, ওদের অনেক আছে, আমার কিছুই নেই।

**ক্ষুধা/তৃষ্ণা :** সকল ভাইবোনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে পর পর সাজিয়ে রাখা আছে ঘরে তৈরি পায়েস। পুরো শীতকালের জন্যে বরাদ্দ মাত্র একটিবারের জন্যে তৈরি মিষ্টান্ন। দ্রুত নিজেরটা গলাধঃকরণ করে আরেকটি বাটিও চেটেপুটে শেষ করে ফেলি। ভাগ্যিস, বাড়ির বিড়ালটা কথা বলতে জানে না। সে-ই যে এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে পুরোপুরি দায়ী, সে সম্পর্কে আর যার-ই থাক, আমার যে কোনো সন্দেহ নেই সে কথা জানাতে ভুলি না কাউকে, কেননা নিজের চোখে আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু বড়ই অসময়ে-বড় দেরিতে। বলি, মিষ্টান্নটা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি তাই।

**সন্দেহ/আশঙ্কা :** বড় চাকরি করার সুবাদে আর পোড়া দেশটাতে লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের চাকরি সংস্থানের মারাত্মক ঘাটতির কারণে বড় বিপদে পড়ি মাঝে মাঝেই। আগ্রহ দেখিয়ে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আলাপ করতে আসে যারা, অথবা

আন্তরিকভাবে নিজেদের ঘরে নেমন্তন্ন করে যখন অর্ধপরিচিতজন, প্রায় অবধারিতভাবেই দেখি, সেই সঙ্গে সবিনয়ে আসে একখানি চাকরির প্রার্থনা অথবা সুপারিশ। আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের আগ্রহে তার নিজস্ব বাসভবনে ঢাকায় বসবাসরত আমেরিকায় পড়াশোনা করা প্রাক্তন ছাত্রদের এলামনাই এসোসিয়েশন তৈরি হলো যেদিন, সেদিন-ই প্রথম আলাপ হলো নূর সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। এক সময় কলরেডোতে লাইব্রেরি বিজ্ঞানে পড়াশোনা করতেন নূর। সুআলাপী দম্পতি। ফেরার সময় জানতে পারি, এত রাতে স্কুটারে করে হাতিরপুলে ঘরে ফিরবেন তাঁরা। শুনে জোর করে আমাদের গাড়িতে করে পৌঁছে দিই তাঁদের বাসায়। এই সামান্য ব্যাপারটির জন্যে এতবার তিনি ফোন করবেন, বাড়িতে নেমন্তন্ন করবেন কল্পনাও করিনি। বারবার পোড় খাওয়া, হোঁচট খাওয়া নষ্ট মন আমার। খালি মনে হয়, ছেলেমেয়ে অথবা ভাগ্না-ভাগ্নি কারো চাকরির দরকার নিশ্চয়। বহুবার এড়িয়ে যাবার পর, একবার যেতেই হলো হাতিরপুলে তাঁদের বাড়িতে। আমাদের সম্মানে নূর সাহেব তাঁর বিবাহিত ছেলেমেয়েদেরও পরিবারসহ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেদিন। ঘরভর্তি আত্মীয়স্বজন। উৎসবের আমেজ। প্রচুর রান্নাবান্না করা হয়েছিল যেমনটি হয়ে থাকে। একসময় খাওয়াদাওয়া শেষ হয়। মিষ্টি, পানসুপারি-ও। অথচ এখনও কোনো গুণী, শিক্ষিত, অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়েকে কাছে ডাকা হলো না যে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে তার আর্জি পেশ করবে– একখানা ছোটখাটো চাকরি কেবল, আর কিছু নয়। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠি। অতি প্রত্যাশিত বিড়ম্বনার সেই অবধারিত পর্যায়টুকু পার করে দিই না কেন আমরা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব? কিন্তু না। সে মুহূর্তটি আসে না। প্রস্থানের জন্যে তৈরি হলে, দোতলা থেকে বাড়ির পুরো দল আমাদের পেছনে পেছনে নিচে নেমে আসে। সকলে সার বেঁধে দাঁড়ায় গেটের কাছে আমাদের বিদায় দিতে। হঠাৎ নূর সাহেব এক মিনিট দেরি করতে বলে দ্রুত ওপরে চলে যান, একটা কিছু ভুলে গেছেন তিনি। এক্ষুণি ফিরবেন। আমি সভয়ে চারদিক তাকাতে থাকি, কে আসেনি নিচে যাকে ওপরে দেখেছি আগে, কাকে ধরে সামনে এনে দাঁড় করাবেন নূর সাহেব– কে সেই সহস্র-সহস্রের ভেতর আরও একটি চাকরিপ্রার্থী বেকার তরুণ? না। কেউ নয়। নূর সাহেব একাই ফিরে এলেন। হাতে কাগজ দিয়ে জড়ানো একগুচ্ছ লাল গোলাপ। তিনি ওগুলো আমার স্বামীর হাতে তুলে দেন। ক'দিন আগে কাগজে দেখেছেন ভক্তদের তরফ থেকে ঘটা করে ওর ষাট বছরের জন্মদিন পালন করার সংবাদ। ঠিক ঐ জগতের মানুষ নন বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গিয়ে উপস্থিত হননি অনুষ্ঠানে, কীরকম সংকোচ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে দেরিতে হলেও জন্মদিনের

শুভেচ্ছাটা জানাতে দোষ কী? চলন্ত গাড়ি থেকে আমি বিস্ময়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখি নূর সাহেব ও তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিসহ হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন আমাদের।

**পরনিন্দা/পরচর্চা :** আমার চরিত্রে বহু দোষ। কাজেকর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি তার চেয়েও অনেক বেশি। তারপরেও বুঝি না, পৃথিবীতে করণীয় এত কিছু থাকতে কেন যে সে অন্যের কাছে নিরন্তর কেবল আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে বেড়ায় যার অধিকাংশই তার মনোকল্পিত। আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার বাধ্যবাধকতার মতো কোনো উপকার আমি করিনি তার। কোনো বাঁধন, কোনো দায়ই থাকার কথা নয় তার, আমার প্রতি। তাহলে? তাহলে কেন এত নিন্দা করে আমার?

**ঘৃণা/বিদ্বেষ :** কেবল তার নাম আর গায়ের রঙটি পছন্দ নয় বলে তাকে প্রতিবেশী হিসেবে মেনে নিতে রাজি হলো না তারা কেউ। আশপাশের বাড়ির সকল বাসিন্দারা এককাট্টা হয়ে যখন জীবন একেবারেই দুর্বিষহ করে তুলল এই নবাগত বাড়ির মালিকটির যে, এই অঞ্চলের একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষ, যার গায়ের রঙ সাদা নয়, যে ধর্মে খ্রিস্টান নয়, ইংরেজি ভাষা যার প্রাথমিক ভাষা নয়, তখন বাধ্য হয়ে সেই গাঢ় চামড়ার লোকটি তার অনেক শখে কেনা স্বপ্নের বসতবাড়িটি গৃহহীনদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে দান করে দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

**অনিষ্ট/কৃতঘ্নতা :** যে একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচিয়েছিল, গোপনে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিল, দুবেলা অন্ন জুগিয়েছিল, আজ তার একমাত্র কন্যাটিকে আমি অতি অনায়াসে, সজ্ঞানে, স্থির চিত্তে নিজের হাতে বিয়ের নাম করে এক নারী-ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিলাম।

**সংশয়/অবিশ্বাস :** স্বামীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে নবজাতক কন্যাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরার সময় আমার ঘনিষ্টতম বান্ধবী, যে আবার আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রী-ও বটে, তার গাড়িখানা নিয়ে নিজে আসতে পারবে না, পরিবর্তে, তার প্রতিবেশীকে পাঠাবে হাসপাতালে আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে, এটা ছিল আমার কাছে অচিন্তনীয়। মনে মনে ভাবলাম, বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ। প্রবাসে এরকম অবস্থায় শেষ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতা। প্রথম শিশু-সন্তান নিয়ে স্বজনবিহীন একলা ঘরে ফেরা। অভিমানে, অনুযোগে মন যখন ভারাক্রান্ত, চক্ষু ছলছল, বন্ধুত্বের গভীরতায় যখন সন্দেহ গাঢ় জমাট বাঁধা, শিশু কোলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি সহাস্যে আমাদের বরণ করার জন্যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে– হালকা হলুদ সিল্কের শাড়ি পরনে, হাতে একগাদা রকমারি উজ্জ্বল রঙের

তাজা ফুল। মুখে চোখে এক অনাবিল আনন্দ, তৃপ্তি আর প্রশান্তি। আমাদের অতি সাধারণ ছোট্ট বাড়িটার প্রতিটি ঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আনুষ্ঠানিকভাবে সজ্জিত করেছে সে একা হাতে। তারপর অপেক্ষা করছে আমার জন্যে-আমাদের জন্যে। অপেক্ষা করছে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির সকল তদারক শেষে-যেখানে যা থাকা দরকার, সব কিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা সাঙ্গ করে। সামনের দরজায় ও ঘরের ভেতরের লম্বা দেয়ালে ঝুলছে হলুদ আর সাদা রঙের একসঙ্গে পাক-লাগানো ঘন-কোঁকড়ানো সরু রিবন। সেই সঙ্গে গাঢ় গোলাপির ওপর বড় বড় সাদা হরফে লেখা বন্যার, 'Welcome Home...'।

**গর্ব/অহংকার :** তিন প্রজন্মের কোটিপতি তোমরা। উঁচু অংশ। সেই সঙ্গে তেইশ বছরের উদ্ভিন্ন যৌবন আর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি। তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করা শুরু করলে। এখন বুঝতে পারছ, যা তোমার নিজস্ব অর্জন নয়, যা নিজের মধ্যে ধারণ করতে কোনো প্রচেষ্টা, সাধনা বা পরিশ্রমের দরকার হয় না, জীবন নামক প্যাকেজটির ভেতর প্রাথমিকভাবে যা আপনাআপনি চলে আসে, তা হয় বেশিদিন ধরে রাখা যায় না, নয়তো তা নেহায়েতই মূল্যহীন।

**মোহ/নেশা :** প্রচুর সুযোগ আর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কাল রাতটা যখন স্বাভাবিকভাবে, ঘটনাবিহীন অবস্থায় পার করে দিতে পেরেছি আমরা, কঠিন এক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি দু'জনেই। কাল রাত ছিল একটি জটিল রাত, এক বিশাল সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণ। এক অভূতপূর্ব ক্রান্তিকাল। আমাদের সামনে দুই জগতের দরজাই ছিল খোলা,- হয় ইচ্ছার কাছে, প্রায় অদমনীয় আবেগ আর অভিলাষের কাছে তাৎক্ষণিক আত্মসমর্পণ, নয়তো অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ অথচ স্থায়ী সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা। বিস্ফোরণের বলি বহু দেখেছি জীবনে। তোমাকে একান্ত করে পেতে গিয়ে স্থায়ীভাবে হারাতে চাইনি। আমি উত্তেজনাকে বিসর্জন দিয়ে তাই সৌম্যকে বেছে নিয়েছি, যদিও জানি, বিশ্বাসও হয়তো করি, বারবার কাপুরুষের মতো মরণের চাইতে মুহূর্তের জন্যে একবার নড়েচড়ে জ্বলে ওঠা, একবার বাঁচার মতো বাঁচা, সার্থক জীবনেরই ইঙ্গিত।

**গোপনীয়তা/ভণিতা :** কুরুক্ষেত্র বানাবার মতো অপরাধ এটা নয়। সে বোঝাতে চেষ্টা করে, ধনেপাতার গন্ধ তার যে ভয়ানক অপছন্দ, সেটা এত বছর ধরে আমাকে জানতে না দেওয়ার মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র বা দুরভিসন্ধি ছিল না তার। একমাত্র কারণ যার জন্যে একথা আমাকে কখনো সে বলেনি, আর তা হলো সে জানে আমি ধনেপাতা ভীষণ পছন্দ করি। কেন মিছেমিছি আমাকে বঞ্চিত করবে যেখানে সত্যিকারের ভালোলাগার জিনিস এত কম পৃথিবীতে? তাছাড়া, বছরের পর বছর খেতে খেতে আজকাল আর ধনেপাতার গন্ধটা আগের মতো তেমন তীব্র আর জংলিও মনে হয় না তার কাছে। এমনকি কখনোসখনো কোনো কোনো

তরকারিতে এই গন্ধ ভালোও লাগে তার। মানুষ নতুন কিছুতে, প্রাথমিকভাবে অপছন্দের কিছুতে, আস্তে আস্তে "taste develop"-ও তো করে। করে না? সে বোঝাতে চেষ্টা করে আমায়। যেমন– ধরা যাক, আমি বিয়ের পর প্রথম প্রথম চাইনিজ খেতে একদম পছন্দ করতাম না। এখন তো প্রতিমাসে একবার অন্তত চাইনিজ খাবার না খেলে চলে না আমার। কিন্তু এসব যুক্তির কথা আমি মানতে রাজি নই। আমার সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, এটা এতদিন, এত বছর একত্রে ঘর করার পরেও কেন আমার কাছে গোপন করে রাখলো সে? কেমন করে তা পারলো? কেন আমাকে বোকার মতো তৃতীয় ব্যক্তির মুখ থেকে তা জানতে হলো আজ? তাহলে কী সে তার জীবনের এমন আরও অনেক কিছুই গোপন করে রেখেছে আমার কাছে? তার নিজস্ব এবং ভিন্ন একটা জগৎ কি রয়েছে যেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ? তার সম্পর্কে, তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে আরও নতুন নতুন তথ্য কি আবিষ্কার করবো আমি? সত্যি বলতে কী, তার ওপর বিশ্বাস হারাতে বসেছি আমি। ধনেপাতা এমন মহা কিছু খাদ্যদ্রব্য নয় যে আমাকে তা খেতেই হতো। তার অপছন্দ জানলে আমিও না হয় খেতাম না তা। পৃথিবীতে রকমারি খাবারদাবারের অভাব আছে? পুরো এক সপ্তাহ কেটে যাবার পরেও যখন আমার মাথা ঠাণ্ডা হয় না, দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ সামান্য ধনেপাতাকে কেন্দ্র করে, তখন প্রকৃতই কিছুটা রাগান্বিত হয়ে পড়ে সে। সেদিন সকালে অফিসে যাবার মুখে একটা কঠিন প্রশ্ন রেখে যায় সে আমার জন্যে। ভেবে দেখতে বলে, তার চরিত্রে বা তার ভালোলাগার জিনিসের মধ্যে এমন কিছুই কি নেই যা আমি মোটেও পছন্দ করি না, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করি কেবল এই জন্যে যে হয় সেটা তার বিশেষ পছন্দের, না হয় যার ওপর তার তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই– যা প্রাকৃতিক বা জেনেটিকভাবে পূর্বনির্ধারিত? ভাবনার জন্যে বেশিদূর এগুবার আগেই আমি আবিষ্কার করি, ওর বিশেষ পছন্দের নায়িকা সুচিত্রা সেনের পুরনো ছবিগুলো। বিশেষ করে উত্তম-সুচিত্রা জুটির সেই রমরমা ছবিগুলো, যা পুনঃপুন রাত জেগে দেখে সে এবং চায় আমিও তার পাশে বসে তারই মতো করে তা উপভোগ করি। সেসব ছবি দেখতে দেখতে মনে মনে সেই দুর্দান্ত আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল ও দেহবল্লভের অধিকারী নায়িকা সুচিত্রা সেনের অতি-অভিনয় আর ন্যাকামির জন্যে যতই বিরক্ত হই না কেন আমি, মুখে হাসি অক্ষুণ্ন রেখে এবং আগ্রহ সহকারে সম্পূর্ণ ছবিটি পাশে বসে দেখে এই ধারণা কি দিই না তাকে যে, সুচিত্রা-উত্তম জুটির হিট ছবিগুলো তার মতোই আমারও খুব পছন্দের তাহলে?

# স্বয়ম্বরা

রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভা।

রাজা-রানি, উজির-নাজির, দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য অতিথিবর্গ উজ্জ্বল পোশাক আর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাজউদ্যানে সমবেত।

রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা বাগানের মধ্যস্থলে দুর্লভ মণিমুক্তাখচিত এক স্বর্ণাসনে শ্বেত ও রক্তিম বসনে উপবিষ্টা।

সকলের জন্যই এক মহা বিস্ময় এই রাজকন্যা। অতি বিদুষী সে। বছরের পর বছর ধরিয়া সর্বকালের সর্বজাতির ইতিহাস, সমাজ ও বিজ্ঞান-সাধনা পঠন ছাড়াও দর্শন ও সাহিত্যে তাহার বহুমাত্রিক জ্ঞানার্জন তাহাকে জীবিত কিংবদন্তির মর্যাদা দিয়াছে। তাহার সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গীত হিংস্র সিংহকেও নাকি বশ মানাইতে সক্ষম। আর তাহার রচিত কবিতা? উহা তো শব্দগুচ্ছ নয়, যেন মতির মালা। তাহার অঙ্কিত অসাধারণ সব বিমূর্ত ও নিসর্গ চিত্রকলা অনায়াসে রাজপ্রাসাদকে এক দুর্লভ শিল্পাঙ্গনে পরিণত করিতে সক্ষম। কিন্তু রাজকন্যার এত যে গুণ, তাহা তাহার রূপের মতোই সকলের চক্ষুর আড়ালেই থাকিয়া যায়। জনসম্মুখে সংগীত পরিবেশন, কবিতা প্রকাশ অথবা চিত্র প্রদর্শন দূরে থাকুক, রাজকন্যার দর্শন মেলাও অসম্ভব। সুন্দরী, যুবতী, গুণবতী কন্যা প্রাসাদের বাহিরে এমনকি নিজের কক্ষের বাহিরেও ক্বচিৎ কালাতিপাত করে। ফলে রাজদরবারের অনেকেই তাহাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পর্যন্ত পায় নাই। এমনই যে রহস্যময়ী ও অবগুণ্ঠিতা রাজকন্যা, তাহার বিবাহের কী ব্যবস্থা হইবে? রাজা চিন্তিত। রানির নিদ্রা তিরোহিত। এমন সময় স্বয়ং রাজকন্যাই একদিন আগাইয়া আসে একটি প্রস্তাব লইয়া। স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হউক। পাণিপ্রার্থী দেশ-দেশান্তর হইতে আগম্য তুবুদের মধ্য হইতে মন্ত্রীবর্গ ও পণ্ডিতকুল মিলিয়া সবচাইতে জ্ঞানী, গুণী, চরিত্রবান ও সুশ্রী পাঁচজন যুবককে বাছাই করিয়া লইয়া আসিবেন রাজউদ্যানে। তাহাদের সম্মুখে রাজকন্যার একবার পদব্রজে আগমন ঘটিবে, কেবল পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়ের জন্য। তাহার পর কন্যা যাইয়া উপবিষ্ট হইবেন বাগানের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপিত একটি আরামকেদারায়। অপেক্ষারত যুবককুল দশ মিনিটের জন্য রাজকন্যাকে পরিদর্শন করার সুযোগ পাইবে। অতঃপর একে একে

তাহারা কন্যার কাছে ব্যক্ত করিবে কোন বিশেষ কারণে তাহারা এই রাজকন্যাকে বিবাহে আগ্রহী। সকলের কথা শ্রবণান্তে রাজকন্যা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উপস্থিত সুধীজনের সম্মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করিবে কেন এই বিশেষ ব্যক্তিটিকে সে মনোনীত করিয়াছে।

প্রথম রাজপুত্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, কেন সে এই রাজকন্যাকে বিবাহে আগ্রহী? রাজপুত্র বলিল, "রাজকন্যার প্রজ্ঞা আর মেধাই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সেই বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডারের জন্যই আমি তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছি।"

দ্বিতীয় যুবা আসিল। "কন্যার সুরেলা মধুর কণ্ঠ, সংগীতের উপর রাজকন্যার সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং একজন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ হিসেবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমাকে বিমোহিত করিয়াছে।"

তৃতীয় রাজপুত্রকে একই প্রশ্ন করা হইল। তাহার উত্তর, "আমি রাজকন্যাকে পত্নী হিসেবে পাইতে ইচ্ছুক কেননা তিনি একজন অসামান্য কবি। কবিতার প্রতি আমার দুর্বলতা এবং তাঁহার লিখিত উঁচুমানের কবিতাই রাজকন্যাকে আমার নিকট অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।"

চতুর্থ রাজার পুত্র আসিয়াই কহিল, "রাজকন্যার শিল্পীসত্তাই আমাকে সবচাইতে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার তুলিতে রঙের বিন্যাস ও মাধুর্য এবং বিভিন্ন রেখা ও আকৃতির বিচিত্র সমাবেশ আমাকে চিরকাল যাদুর মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে আমি মনে করি।"

পঞ্চম যুবক আসিল। রাজকন্যার দিকে সোজা তাকাইয়া বলিল, "রাজকন্যা, আপনার অনুপম রূপ আমাকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়াছে। আপনাকে যখন দেখিলাম, আমার শরীরে একটা অভূতপূর্ব শিহরণ জাগিল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনায় অধীর হইলাম আমি। আপনার হাঁটা, আপনার কথা বলা, আপনার ঐ বসিয়া থাকার ভঙ্গি আমাকে চঞ্চল করিয়াছে। গোলাপের পাপড়ির মতো নরম ও রক্তাভ আপনার ঐ ওষ্ঠযুগল, এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল, মসৃণ ত্বক, সুডৌল পয়োধর, আপনার দীর্ঘ উজ্জ্বল কেশরাশি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। আপনাকে আমার চাই। আর তাহার জন্যই আপনাকে বিবাহ করিতে আমি আগ্রহী।" রাজা ও রানি যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের চক্ষু ও মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান। প্রহরীরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসে। উপস্থিত সুধীবৃন্দ অস্বস্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। এসব কী বলিতেছে এই পঞ্চম যুবক? এই প্রগলভতার শাস্তি কী হওয়া

উচিত? রাজকন্যা কেদার ছাড়িয়া সামনে আগাইয়া আসেন। ইশারা করিয়া প্রহরীদের নিবৃত্ত করেন। তাহার পর রাজা ও রানির সামনে মাথা নিচু করিয়া অভিবাদন জানাইয়া কন্যা ঘোষণা করেন, "এই শেষোক্ত যুবককেই আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিলাম।"

কিন্তু কেন?

রাজসভায় প্রবল গুঞ্জন। রাজা রানি উভয়েই স্তম্ভিত। বিস্মিত সুধীজন পরস্পরের মুখবয়বের নিরীক্ষণে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে থাকেন।

রাজকন্যার এত যে গুণ, কোনো গুণই যে এই যুবককে আকৃষ্ট করে নাই! এত শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না, স্বাধীনচেতা রাজন্যার এ কী মতিভ্রম?

ইহা কেমন মনোনয়ন?

রাজকন্যা হাসে। যুবকের হাত ধরিয়া দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করে : "আমি উহাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করিয়াছি, কারণ সে সত্যবাদী।"

# অবশেষে মুখোশবিহীন

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, "এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখ এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে", আমি তক্ষনি ঠিক করে ফেললাম আমায় আর কখনো দেখবে না।

কাল দুপুরে তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে সদ্য আমার গোপন ঘরটিতে ঢুকে স্নানের জন্যে তৈরি হচ্ছি। সারা দিনরাত্রির এই একটু সময়ই নিজের মতো করে পাই। পাশের দেয়ালে সারি সারি সব মুখোশ টাঙানো। সবই আমার, যখন যেটা দরকার পরি।

ছেলের জন্যে করা ডান পাশের সাদা চুলের মোটা রেখা সদ্য ধুয়েছি জলে।

স্বামীকে খুশি করতে যে ত্রিনয়নী খয়েরি টিপ পরি তাও মুছে ফেলেছি।

বাবার জন্যে কানে ঝোলানো তারার মাকড়ি খুলে রেখেছি ততক্ষণে।

রুগীদের জন্যে নেওয়া স্টেথিস্কোপ আর চশমাও আর নেই।

আর তখনই তুমি ঘরে ঢুকলে।

তোমার দেওয়া লাল গোলাপটি তখনও আমার চুলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তুমি সেদিকে তাকালে। আমাকে বড়ো ভালো লাগল তোমার। খুব চেনা, খুব আপন মনে হলো। তুমি আমায় সম্পূর্ণভাবে দখল করতে চাইলে। অবশ্য তখনও জান না কেন আজ এত বেশি পরিচিত, এত কাছাকাছি মনে হচ্ছে আমাকে। আমি জানি। কারণ যে চোখজোড়া দেখে তুমি অভ্যস্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ ছিল আমার চোখ গতকাল।

কেন না চোখের তারা থেকে একে একে খুলে নিয়েছি তখন-

সবুজ চাকতি যা আমাকে পরম সহিষ্ণু করে স্বামীর কাছে,

লাল চাকতি যা ছেলের কাছে আমার দুরন্ত সঙ্গ লোভনীয় করে,

বাদামি চাকতি যা রুগীকে পরম নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা দেয়,

সোনালি চাকতি যা আমার বাবার কাছে আজও আদরের দুলালী করে রাখে।

আমি কেবল চোখ থেকে গোলাপি চাকতিটা খুলতে যাব, যার ভেতর দিয়ে তোমাকে দেখি বলে আমার সে চোখ, সে দৃষ্টি তোমার চেনা, যে চোখে তুমি কামনার আগুন দেখ, ঠিক তখনই তুমি এলে।

তোমার এ সময় আসার কথা ছিল না।

একটু আগেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তবু তুমি এলে। বড় অসময়ে।

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, "এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখ এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে", আমি তক্ষনি ঠিক করে ফেললাম আমায় আর কখনো দেখবে না।

গতকাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে সরাসরি এ সাজঘরটাতেই ঢুকেছিলাম। ভেবেছিলাম স্নান করার আগে তোমার পরিচিত মুখোশটি খুলে ছেলের চেনা মুখোশটি পরে একবার ওর ঘরে যাব। সেটা করলে ভালোই হতো। কিন্তু সে সুযোগ আমায় দাওনি। বড়ো তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলে। তুমি এভাবে হঠাৎ চলে আসতে পার, এটা কখনো ভাবিনি। তবে তুমি যে এমন নিজস্ব করে আমায় চাইলে, সেটা শুধু ওই মুখোশের জন্যেই নয়। ও মুখোশে তো আমাকে আগেও কতবার দেখেছ। সত্যি বলতে কী আমার কেবল ওই মুখটাই তো তোমার চেনা। তবু কেন গতকাল এমন করে আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করলে? এত বড়ো স্বার্থপরের মতো?

কারণ, আমার পুত্রের জন্যে ধারণকৃত শব্দ করে হাসি বন্ধ করেছিলাম তখন।

স্বামীর মন ভোলাতে গালের দু'পাশে টোলও ফেলিনি সে সময়।

রুগীর অবস্থা নিরূপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানো স্থগিত ছিল বিলক্ষণ।

বাবার পরিচিত নাক ও ঠোঁট কুঁচকানো সেই হাসির ভঙ্গিটিও ছিল নির্বাপিত।

অথচ তোমার পছন্দমতো ঠোঁটের লাল লিপস্টিক তখনও ছিল স্মিত হাসিতে আবদ্ধ।

তোমার ভালো লাগল আমাকে।

কারণ সেই মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব ছিল না সেখানে। আমাকে একলা করে পেতে চাইলে। নিরাভরণ হতে হতে আমি তখন কেবল স্নান করতে যাচ্ছিলাম।

আমার এ ঘরটির অস্তিত্ব কেউ জানত না। এই এত বড়ো বাড়ির ভেতর আট ফুট বাই ছয় ফুটের এই যে গোপন ছোট্ট ঘরটি, এটিই ছিল দুনিয়ায় আমার একমাত্র সম্পদ, একমাত্র অর্জন। এই বিশ্বসংসারে এছাড়া আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। নিত্য ব্যবহার্য হাতব্যাগটিও আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই। এই ঘরে শুধু মুখোশ, পোশাক, রঙ প্রসাধন আর দৈনন্দিন ব্যবহারের রকমারি সামগ্রী দেখতে বা বদলাতেই আসি না, প্রতিদিন এ ঘরটিতে এসে কিছুক্ষণের জন্যে আমি গা থেকে সব রঙ ধুয়ে ফেলি। সমস্ত গহনা, মুখোশ, আর পোশাক খুলে কিছুক্ষণ নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেখি। চুপচাপ ভাবি। ছোট জানালাটা ধরে বাইরের দিকে তাকাই। পাখির ডানা ঝাপটানো শুনি। ফাল্গুনী হাওয়ায় কান পাতি। নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর পাশের বাড়ির ফুলের রঙের বৈচিত্র্য আমায় মুগ্ধ করে। আমি চুপচাপ বসে থাকি। সে সময়টায় আমার চারদিকে আর কেউ থাকে না।

না তুমি।

না স্বামী।

না পুত্র।

না পিতা।

না রুগী।

ছয় ফুট বাই আট ফুটের এই ঘরটাতে সাড়ে পাঁচ ফুটের আমি ছাড়া আর কারো জায়গা হয় না। তারপর আমি এক সময় এত বিশাল, এত শক্তিশালী, এত বড়ো হয়ে উঠি যে, আমাকে ধরে রাখার জন্যে আর যথেষ্ট বড়ো মনে হয় না ঘরটিকে। আর তখন, ঐ অর্জিত শক্তি আর সাহস নিয়ে নিজের খুশিমতো কোনো একটা মুখোশ চাপিয়ে প্রবল তেজের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি পৃথিবীর মুখোমুখি হতে।

আমার এ ঘরে, এ নিজস্ব ভুবনে কারো প্রবেশাধিকার নেই। তুমি সেটা জানতে না। আর তাই সব নিয়ম ভেঙে অর্বাচীনের মতো সটান আমার নিভৃত কক্ষে ঢুকে পড়লে। এর আগে আর কেউ এটা করেনি।

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, "এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখ এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে", আমি চমকে গেলাম তোমার স্পর্ধা দেখে। তোমার স্বার্থপরতায় ক্ষুণ্ন হলাম। আর তক্ষনি ঠিক করে ফেললাম আমায় আর কখনো দেখবে না।

এখন আমার চোখের সামনে কেবল পাঁচটি মুখোশ। দেয়ালে ঝুলছে চারটি। আর তোমার জন্য তৈরি পঞ্চম মুখোশটি যা এতক্ষণ পরে ছিলাম, সেটা এখন আমার হাতে। সবার আগে তোমার মুখোশটাই ভাঙছি আমি। আমার হাতের চাপে গুঁড়ি হয়ে ভেঙে পড়ছে তোমার পরিচিত, অতি প্রিয় চোখের পালক। বাঁকানো সরু ভুরু, ঈষৎ গোলাপি কপোল। লাল টিপ, কানের পাশে গালের ওধারে ছোট ছোট লম্বা চুলের গোছা আস্তে আস্তে ঝরে পড়ল মাটিতে। তারপর নিলাম বাবার জন্যে তুলে রাখা মুখোশটি। ওটা ভাঙতে অসুবিধে হয়নি। অনেকদিন ব্যবহার করেছি বলে বেশ জীর্ণ হয়েই ছিল। গায়ের রংটাই ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছিল একটু, চামড়াটা ঝুরঝুর।

ছেলের জন্যে কপালে ভাঁজ-পড়া স্কুলশিক্ষিকার মতো প্রশান্ত অবয়বের মুখোশটি ভাঙতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। আহা ছেলে আমার মাকে না হয় একটু বয়সীই দেখতে চেয়েছিল। তাই বলে মাতৃহারা হতে তো চায়নি কখনো।

রুগীদের জন্যে যে মুখোশখানা পরি, সেটাতেই বেশির ভাগ লোক চেনে আমায়। চুলগুলো টেনে আঁচড়ে পেছনের দিকে খোঁপা করা, চশমা চোখে ঐ ডাক্তার-মুখোশটি শব্দ করে ভাঙলাম এইমাত্র। বাকি রইল শুধু স্বামীর জন্যে ব্যবহৃত মুখোশখানা। বাড়িতে এটাই পরে থাকি বেশির ভাগ সময়। ওটার গালে কপালে এখনও মাছ রান্নার গন্ধ লেগে আছে। আমি হাত থেকে ফেলে দিলাম ওটা। চোখের সামনে সহস্র টুকরোয় ভেঙে গেল মুখোশটা।

আমি এখন পরিপূর্ণ মুক্ত। আর কোনো মুখোশ নেই।

কিছুক্ষণ পর বেলা দশটার ট্রেনটা চলে যাবে এ পথ ধরে। ট্রেনের নিচে থেঁতলে থাকা মাংসপিণ্ডকে ঘিরে লোক জমবে। পুলিশ আসবে লাশ শনাক্ত করতে। সকলে যখন হিমশিম খাবে, তুমি হঠাৎ আমার পরনের শাড়িটি দেখে চেঁচিয়ে উঠবে। এ শাড়ি যে নিজে ডিজাইন করে তাঁতি ডাকিয়ে তৈরি করিয়েছিলে তুমি। এর দ্বিতীয়টির তো অস্তিত্ব নেই কোথাও। আমাকে দেখে চিনতে না পারলেও আমার পোশাক তোমাকে ঠিকই বুঝিয়ে দেবে আমি চলে গেছি।

বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠবেন তাঁর দেওয়া ডান হাতের সোনার বালাটি দেখে।

সমুদ্রসৈকতের শৌখিন দোকান থেকে কেনা ছেলের ঝিনুকের কানের দুল তখনও থাকবে কি? অন্তত একটি কানে? না হলেও অন্তত তার দেওয়া পুঁতির মালার অবশিষ্ট কয়েকটি পুঁতি নিশ্চয়ই তখনও থাকবে গলায়।

কাপড় সরিয়ে বাঁ হাঁটুর ওপর কালো জন্মদাগটি দেখে স্বামীর চিনতে কষ্ট হবে না আমাকে। ওটা যদি থেঁতলেও যায়, ডান ঘাড়ের নিচে পিঠের ওপর বড়ো জড়ুলটা ঠিকই থাকবে। ওটা তুমিও দেখেছ। কতবার। দেখলে চিনতে। কোনো অসুবিধে হতো না। কিন্তু লোকসম্মুখে ওকথা স্বীকার করতে পারবে না। আর তা ছাড়া আমি মৃত হলেও কেউ তোমাকে সেটা দেখাবে না।

কিন্তু আমার মুখটা যদি কোনো কারণে অবিকৃত থেকে যায়! যদি চলন্ত ট্রেনের গতি যথেষ্ট তীব্র না হয় অথবা আমার আত্মনিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার শরীরটাকে এক টুকরো মাংসপিণ্ড বানাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কিন্তু ও-মুখ দেখে তোমরা কেউ আমায় চিনবে না।

অথচ ওটাই ছিলাম আমি, যাকে কেউ কখনো দেখনি তোমরা।

তুমি রাগ করো না লক্ষ্মীটি। সত্যি বলছি, এই ছোটাছুটি আমি আর করতে পারছিলামও না। এরকম ঘন ঘন মুখোশ আর পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে আর সাত রকম রঙ মাখতে আর মুছতে আমি আসলেই বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর তক্ষনি আমার নিভৃত ঘরটিতে এসে তুমি হানা দিলে।

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, "এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখ এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে", আমি তক্ষনি ঠিক করে ফেললাম তুমি আমায় আর কখনো দেখবে না।

# মহীলতা

উত্থিত শিশ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে ম্যানহাটান। না, অর্থনৈতিক দুনিয়ার কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান গগনছোঁয়া সব সুউচ্চ অট্টালিকা দেখে একথা মনে হয়নি তার। বরং ঝলমলে উজ্জ্বল ম্যানহাটান ছেড়ে তার মাটির গহ্বরে যখন প্রবেশ করে, যেখানে গেলে এ শহরের আনুলম্বিক রূপ নয়, শায়িত রূপকেই কেবল প্রত্যক্ষ করা যায়, তখনই এ কথাগুলো মনে আসে। অর্থাৎ সাবওয়েতে উঠলেই প্রতি কক্ষে টাঙানো নিউইয়র্কের পাতাল রেলের ম্যাপটি চোখে পড়ে আর এই ম্যাপ দেখলেই দৃশ্যটি চোখে ভাসে তার। এছাড়া অন্য কিছু সে দেখে না সেখানে।

পশ্চিমে মাথা তুলে দক্ষিণে মুখ করে উত্তর দিক থেকে ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছে ম্যানহাটান নিউ জার্সি আর নিউইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলের তিন বোরোকে। লাল, নীল, কমলার অসংখ্য শিরা উপশিরায় বাহিত উত্তপ্ত রক্ত ধারণ করে দৃঢ়, প্রলম্বিত চির যৌবনেশ্বর ম্যানহাটান হাডসন আর ইস্ট রিভারের যোনিতে গভীরভাবে প্রোথিত। অনবরত সে ধর্ষণ করে চলেছে কুইন্স, ব্রুকলিন আর স্টাটেন আইল্যান্ডকে। ব্রঙ্কসের অণ্ডকোষে উৎপাদিত কোটি কোটি শুক্রাণুসহ গলগলে বীর্য ছড়িয়ে পড়ছে কুইন্স আর ব্রুকলিনের জরায়ুতে। কী আশ্চর্য নির্বিকারভাবে সেই উদগীরিত জৈবরস ধারণ করছে নিউইয়র্ক শহরের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত অঞ্চলগুলো। দেখে মায়া হয় তার। সেই সঙ্গে ম্যানহাটানের বিক্রমের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে তাকাতেও ভোলে না।

এই দৃশ্যকল্প অজস্র বার মনে এলেও খুব বেশি কারো সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে না সে। রুমমেটসহ দু'একজন বন্ধুবান্ধবের কাছে কথাটা প্রকাশ করতেই তারা তাকে বিয়ে করতে অথবা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে পরামর্শ দিয়েছে। তাদের ধারণা এসবই অবদমিত কামনা-বাসনার প্রতিফলন। কথাটা সত্য হতেই পারে। সে তো কামনা-বাসনার উপস্থিতি অস্বীকার করে না কখনো। কিন্তু সেসব বোধ কি এদের মধ্যেও নেই? তাদের কল্পনায় তাহলে এরকম কোনো দৃশ্য ধরা দেয় না কেন? আর তাছাড়া এই রোগ-জরাহীন সবল ও সক্ষম দেহ, যৌক্তিক মন আর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা নিয়েও যে অসীম একাকিত্ব, যে বিপন্ন বিচ্ছিন্নতা জন্মাবধি তার সঙ্গী, তাকেই-বা তারা কীভাবে বিশ্লেষণ করবে?

সাবওয়েতে আসতে আসতে যা-ই মনে হোক না কেন, রাতে ফিরে যাবার পথে কিন্তু ঐ ম্যাপের দিকে আর তাকায়নি সে। খুব ভালো লাগছে তার।

বহুদিনের জমানো টেনশন শরীর থেকে নির্গত হয়ে গেলে যেমন হালকা, পরিতৃপ্ত লাগে, তেমনি একটা প্রশান্ত ভালো-লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। সাপ্তাহিক বাংলা খবরের কাগজটি ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল সময়মতো।

কাজটির বড়ো দরকার ছিল তার। ট্যুইশনি করার অভিজ্ঞতা এটাই প্রথম নয়। দেশে থাকতেও বহুবার করতে হয়েছে। তবে এখানে– এই নিউইয়র্ক শহরে একটি বাঙালি মেয়েকে ঘরে গিয়ে পড়াবার কথা ভাবতে পারেনি কখনো।

"বুঝলা বাবা, অনেক ভাইব্যা চিন্তাই তোমারে কাজটা দিলাম। তোমাগ' কাছে মাইয়ারে পড়াইতে দিয়া যেইরকম নিশ্চিন্তে থাকতে পারুম, জাত ভাইয়ের কাছে দিয়া পারুম না। পড়াইতে আইস্যা মাইয়াকে লইয়াই ভাইগ্যা গেল আর কি? বুঝলা না? হের লেইগ্যাই তো। তা নাইলে কত পোলারা আইল, বেবাক্‌রেই না কইরা দিলাম।"

গড়গড় করে কথাগুলো বলে যান শামসের আলী। আর তখন তাঁর সামনে উপবিষ্টের চোখে ভেসে ওঠে চৈত্র মাসে ধলেশ্বরীর পারে কড়কড়ে রোদে শাড়ি-পরা হিজড়াদের উদ্দাম নৃত্য। খোল করতাল নিয়ে ঠোঁটে গালে রং মেখে প্রবল উৎসাহে সদলবলে তারা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সংগীত আর নৃত্য। চোখ পিটপিট করে ভালো করে তাকাতেই সে আবিষ্কার করল সে নিজেও একজন শরিক এ প্রমোদ উৎসবে। দুই হাত দুদিকে তুলে তা ধিনা করে নাচছে সে। নাচছে সমগ্র হিজড়ার দল। সে নিজেই নাচছে সবচেয়ে বেশি।

সে নাচছে খুশিতে।

সে নাচছে তার একটা চাকরি হয়েছে।

সে নাচছে তার পুরুষাঙ্গ খসে পড়েছে।

সে নাচছে কেননা সে নিরাপদ।

সে নাচছে তার ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে।

সে নাচছে; শাড়ির কুঁচি দুই হাতে দুদিকে উঁচু করে ধরে নাচছে। সে নাচছে অবশেষে একজন স্বদেশী বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছে।

আহা কী আনন্দ!

আরেকজন হিজড়া। অনবরত নাচছে।

মুখে আঙ্গুল দিয়ে শিস দিচ্ছে।

আনন্দে নৃত্যরত আরেকটি হিজড়া।

আসবাবপত্রে সজ্জিত লিভিং রুমের ফুলকাটা সোফার ওপর ভালো করে আরাম করে বসেন শামসের আলী। তারপর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে যেন আপন

মনেই বলে ওঠেন। "মাষ্টারই আছিল বটে, আমাগ' গ্রামের সেই উপেন মাষ্টারের কথা কই। আইজও ভুলতে পারি না। ঐ রকম মাস্টার আর অয় না।"

কথা বলতে থাকলে শামসের আলী আর থামেন না। উডসাইডের রো হাউজের একতলার বসার ঘরে এখন বেশ গরম। কোণায় দণ্ডায়মান বৈদ্যুতিক পাখা অনবরত ঘুরছে। দেয়ালে সারি সারি সব ছবি ঝুলানো। কাবা শরিফ, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাংলাদেশের প্রকৃতি সবই রয়েছে সেখানে। শামসের আলী ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংলগ্ন সরাইল গ্রাম থেকে সোজা সাগরপাড়ি দেননি। মাঝখানে বেশ কয়েক বছর ছিলেন রাজধানীতে। দোকান ছিল তাঁর সদরঘাটে। ফলে ঘর সাজানো বা আসবাব পছন্দে বেগ পেতে হয়নি আমেরিকা এসে। ঢাকাতেই একরকম ট্রেনিং হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে শামসের আলীর বাসায় আগত অতিথির কানে এখনও গৃহকর্তার শেষ কথার অনুরণন। অচেনা অদেখা উপেন মাস্টার রক্তগত সম্পর্কের কেউ না হলেও সে যে একই বংশের, একই গোত্রের, একই দলভুক্ত স্বভাব গুণাবলিতে, এ সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ রইল না তার। নিজেকে যোগ্য প্রতিনিধিই মনে হচ্ছে। হঠাৎ সে খেয়াল করল বংশপরম্পরায় তার পিতা পিতামহ গ্রামের চাষবাস করছে না আর। প্রবল প্রতাপে স্কুল কলেজ আর পাঠশালায় মাস্টারি করে বেড়াচ্ছে। সে নিজেও নাকের ওপর চশমা ফেলে বেত হাতে নামতা পড়াচ্ছে গ্রামের পাঠশালায়। উপেন মাস্টারের বংশধরের এর চেয়ে যোগ্য পেশা আর কী হতে পারে? গলা ভারি করে গম্ভীর কণ্ঠে মাস্টার বলে উঠল, সে নিজের কানে শুনল সে বলছে, "আরেক কাপ চা হবে?"

"অবশ্যই অইব, কন কী?"

মহাব্যতিব্যস্ত শামসের আলীর ছোটাছুটি আর গিন্নিকে চায়ের জন্যে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি তাকে পরিতৃপ্ত করে।

সবই ঠিক চলছিল।

বিকেলে এক ঘণ্টা করে পড়ানো। দেশে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে চলে আসা রাবেয়ার এখানে হাই স্কুলে ইংরেজি নিয়েই বেশি সমস্যা। ওটাই ঘষেমেজে ঠিক করতে হচ্ছে তাকে। সঙ্গে অঙ্ক কিছুটা। পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে পর্দানশিনা গৃহকর্ত্রীর হাতে তৈরি ঘন ঘন গরম চা, নাস্তা কখনো কখনো, রাতের পূর্ণ খানা পর্যন্ত। মাসশেষে কড়কড়ে নগদ তিনশ'টি ডলার। তাকে পায় কে? ভাবতে অবাক লাগে তার। দেশে থাকতেই এত টাকা করেছে যে লোক, সে ও পি ওয়ান ভিসা পেলেই এদেশে চলে আসে কেন? কিছুতেই এ রহস্যের কারণ খুঁজে পায় না। কী আছে এ দেশে, এ শহরে যে মূল উৎপাটন করে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে

সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশে শিকড় গাড়তেই হবে। সবাই এমন ছুটে আসছে কেন এখানে? যদি জিজ্ঞেস করা যায় সে নিজে কেন এসেছে, তারই কি যোগ্য উত্তর দিতে পারবে? তবে এটা ঠিক, শামসের আলীর মতো অবস্থায় সে আসত না। অন্তত এখনও তাই মনে করে।

মেয়েটা ভারি বিরক্ত করছে ক'দিন ধরে।

পড়াশুনায় মন নেই। শুধু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলতে চায়। অথবা পেনসিল মুখে দিয়ে চুপচাপ চেয়ে থাকে। না, দেয়ালে বা বইয়ের দিকে নয়। পরিষ্কার তার মুখের দিকেই। কাল জিজ্ঞেস না করে পারেনি, "কী দেখছে অমন করে?"

"আপনি মাথায় তেল দেন না কখনো?

"না।"

"কেন?"

"তেল কেনার পয়সা নেই।"

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে রাবেয়া।

"জানেন তো, আমি একদম আমেরিকা আসতে চাই নি।"

"কেন?"

"বন্ধুদের ছেড়ে আসতে খারাপ লাগছিল খুব।"

"তা তো লাগবেই। খুব স্বাভাবিক।"

"এখন কিন্তু আর খারাপ লাগে না।"

"কেন? এরই মধ্যে আমেরিকা ভালো লাগতে শুরু করেছে?"

সে কথার সরাসরি জবাব দেয় না রাবেয়া। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে তর্জনীর নখ ঘষাঘষি করে। আর নিবিষ্ট মনে তার এই শিল্পকর্ম অবলোকন করে। যেন আপন মনেই বলে, "শুক্রবার আর রবিবার অবশ্য এখনও খারাপ লাগে। আপনি আসেন না তাই।"

বলে কী মেয়েটি? বিরক্ত হবে না অবাক হবে বুঝে পায় না সে। কিন্তু রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে কোনোটাই হতে পারে না। উজ্জ্বল চকচকে ঈষৎ বৃহৎ দুটো চোখ মেলে সোজা তারই দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সহজ এবং সরাসরিভাবে এরকম অসঙ্কোচে কোনো মেয়ে তাকাতে পারে সে জানত না। কোনো ছেলের সান্নিধ্যে আসেনি নাকি মেয়েটা কখনো? মহা ঝামেলায় পড়া গেল যা হোক।

"তোমার রচনা লেখা শেষ হয়েছে?"

"আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। এক প্যারাগ্রাফ লিখেছি। এই দেখুন।"

"তোমার ভাইকে বলে আস না র‍্যাপ মিউজিকের শব্দটা একটু কমাক। কান যে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। এমন হৈচৈ হলে পড়ায় মন বসে? দেশে কী গান শুনতো সে যে র‍্যাপের এত ভক্ত হয়ে গেল এরই মধ্যে?"

কোনো উত্তর না দিয়ে রাবেয়া ভেতরে চলে যায়। সে লক্ষ করে আজ সালোয়ার বা জিন্‌স্ নয়, সুতি শাড়ি পরেছে রাবেয়া। আশ্চর্য, এটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি তো! ওর লম্বা কোঁকড়ানো চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে আছে। এত কালো চকচকে চুল। রাবেয়া কি মাথায় তেল মাখে? মাখলেও কিন্তু প্যাচপ্যাচ করে না। কেমন একটা আলগা কোমলতা আর উজ্জ্বলতা ওর কেশরাশিতে। হঠাৎ তার নিজেকে কেমন রাজপুত্রের মতো মনে হয়। যেন স্বপ্রতিভা ও সৌন্দর্যে আলোকিত হয়ে অন্যান্য বহু যোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় বসে আছে সে। হঠাৎ প্রিয়দর্শিনী রাজকন্যা সকলকে চমকে দিয়ে তার অভীষ্ট বর মালা পরিয়ে দেয় তার গলায়। চারদিকে তুমুল করধ্বনি। হঠাৎ সমস্ত শব্দ থেমে যায়। র‍্যাপ মিউজিকের আওয়াজ কমানো নয়, একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে। বিজয়িনীর হাসি নিয়ে ঘরে ঢোকে রাবেয়া। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সে।

ট্রেনে বসে আবার সেই ঋজু নির্মেদ প্রত্যঙ্গটির দিকে তাকায়। ম্যানহাটানের শরীরে তেজ আছে বটে। চিরযৌবন অঙ্গে মেখে কেমন অহংকারী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে! কুইন্স আর ব্রুকলিনও বিনা প্রতিবাদে শরীর পেতে ম্যানহাটানের আকণ্ঠ পিপাসা প্রতিনিয়ত নিবৃত্ত করছে।

ঘরে ফিরে দেখে টেবিলের ওপর পড়ে আছে দেশ থেকে আসা একটি মুখবন্ধ খাম। বাবার হাতের লেখা ঠিকানা। দেখেই বক্তব্যটা বুঝে নেবার চেষ্টা করে। রুমমেট আগেই বেরিয়ে গেছে। সারা রাত ট্যাক্সি চালিয়ে ভোর রাতে ঘরে ফিরবে। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় জামা ছেড়ে একটা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে নেয় সে। তারপর মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করে পেট পুরে খেয়ে নেয়। আফজাল একটা নিরামিষ রান্না বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে ইদানীং। পাঁচমিশালি। দারুণ হয়। গত কিছুদিন ধরে তাই তারা মাঝে মাঝে মাংস ছাড়া ঐ নিরামিষ আর ডাল দিয়েই রাতের খাবার সারছে। ওজন কমানোও অন্যতম উদ্দেশ্য। থালাবাসন ধুয়ে টেলিভিশনটা ছেড়ে দেয়। তারপর খাম খুলে চিঠিটা মেলে ধরে চোখের সামনে।

কল্যাণীয়েষু,

বহু দিন তোমার কোনো পত্র পাই না। অনেক স্বপ্নে বুক বাঁধিয়া তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিলাম। মনে আশা ছিল, পড়াশুনা শেষ করিয়া তুমি সংসারের ভার গ্রহণ করিবে। তোমার কাজেকর্মে সেই রকম কোনো লক্ষণ দেখিতেছি না। কবে যে তোমার এই পড়াশুনা শেষ হইবে ঈশ্বরই জানেন। এদিকে আমাদের বসতবাড়িটা

বোধহয় আর ধরিয়া রাখা যাইবে না। তুমি জান গত এক বছর ধরিয়া বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও খাজনা পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। সেখানে গেলেই বলে, বাড়ির কাগজপত্রে গণ্ডগোল আছে, ঠিক না করাইলে খাজনা গ্রহণ করা যাইবে না। ওইদিকে কাগজপত্র ঠিক করাইতে গেলে বলে খাজনা বাকি রহিয়াছে, ঐ সম্পত্তির ব্যাপারে আইনসঙ্গতভাবে কিছু করা যাইবে না। আমি এক বিশাল গোলকধাঁধায় পড়িয়াছি। পেশকার, মুহুরি, দালালদের পিছনে অনর্থক কত যে টাকা ঢালিতেছি। সব কিছুর মূলে ঐ নচ্ছার নৃপতি আর তোমার জেঠামশাইর নির্বুদ্ধিতা। নৃপতি যদি ঐভাবে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া না যাইত আমাদের হয়ত এমন বিপদ হইত না। এদিকে বয়স্কা কন্যা লইয়া গ্রামের বাড়িতে আর এইভাবে বসবাসও করা যাইতেছে না। নানানরকম উৎপাত। উপরন্তু তোমার ভগ্নির মতিগতিও বিশেষ ভালো বুঝিতেছি না। তোমার মা চিন্তায় ভাবনায় দিন দিন দুর্বল ও বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছে। তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করি।

ইতি আশীর্বাদক তোমার বাবা।

ডেভিড লেটারম্যান শো দেখতে হঠাৎ সে নিজেকে শ্রীনগরের বসতবাড়িতে আবিষ্কার করে। রোয়াকে বসে একটানা বিড়ি ফুঁকছে সে। দেখতে পায় তার পিটোপিঠি ছোট বোন সৃজনী ঠোঁটে পায়ে আলতা মেখে, বুক উঁচু ও সুঁচালো করে পাড়ায় পাড়ায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে। আর তার পেছনে পেছনে ছুটছে গ্রামের আট দশটি বখাটে মাস্তান যুবক। মা কাঁথার নিচে শুয়ে শুয়ে খুকখুক করে কাশছে আর কোঁকাচ্ছে। বাবা বারান্দায় জলচৌকিতে বসে ক্রমাগত অভিসম্পাত করছে তাকে। নিষ্ঠুর ভাষায় ভর্ৎসনা করছে তার অক্ষমতাকে। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। ঝড় আসবে শীঘ্রই। দৃশ্যগুলো এত পরিষ্কার, এত বাস্তব যে সে উঠে হঠাৎ লিভিং রুমের জানালা বন্ধ করতে উদ্যত হয় আসন্ন ঝড়ের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবেই। কাচের বন্ধ জানালায় হাত পড়তেই আবার ফিরে আসে টেলিভিশনের সামনে।

বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ওরা সকলে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। "এই যে বাবা, আইস্যা গেছে। তোমায় বলতে ভুইল্যা গেছিলাম। এক পরিচিত বাঙালির পোলার বিয়া আইজ। রেষ্টুরেন্টে। মহা ধুমধাম কইরা বিয়া হইতাছে। সকলেরই দাওয়াত আছিল। তো মাইয়া কয় অনেক পড়াশুনা আছে। যাইতে চায় না। মিন্টুরেও রাইখ্যা গেলাম।"

স্ত্রী, বড়ো দুই পুত্র ও সর্বকনিষ্ঠা কন্যা নিয়ে বেরুতে বেরুতে আবার ফিরে আসেন শামসের আলী। সিল্কের পাতলা পাঞ্জাবি ও ধবধবে সাদা পায়জামা পরেছেন আজ। বিয়েবাড়িতে যাচ্ছেন বলে।

"তুমি তো বাবা ঘরের ছেলে। তাছাড়া তোমাগ' উপুর আমার খুব বিশ্বাস জানই তো। তাই না এই বিদেশেও মাইয়ারে ঘরে রাইখা বিয়েবাড়িতে যাইতে পারতাছি।"

এক গাল হেসে একটা ছোট্ট কাঠি দিয়ে অভুক্ত মুখের দাঁতগুলো পরিষ্কার করতে করতে বেরিয়ে যান শামসের আলী।

আজ কী যে হলো তার। আজন্ম লালিত চর্চিত সেই অভিনব গুণ সেই ক্ষমতা হঠাৎ যেন তাকে ছেড়ে চলে গেল। যা ভাবা যায়, যা কল্পনা করা যায় তৎক্ষণাৎ সেই পরিবেশে সেই জায়গায় চলে যাওয়া, যেই মানুষটি হতে চাওয়া যায়, পলকে সেই চরিত্র বনে যাওয়া, এ তো কোনো কঠিন কাজ নয় তার জন্যে। চাইলেই তা পারে। করেও প্রতিনিয়ত। এতদিন সে এটাকে একটা অর্জন, আত্মরক্ষার বড়ো হাতিয়ার হিসেবেই বিবেচনা করত। নিজের পারদর্শিতায় কখনো কখনো গর্বিত হতো। কিন্তু দেশ ছেড়ে আসার আগে সব গোলমাল করে দিল আলতাফ। আলতাফ বলে, এটা নাকি একটা মারাত্মক সমস্যা-একটা বড়ো কমপ্লেক্স। যথার্থ একটি নামও নাকি রয়েছে এর। কী নাম জানতে চাইলে উত্তর দেয়নি আলতাফ। শুধু বলেছে, "তুই যদি আমি হতিস এ সমস্যা হতো না তোর। একজন সক্ষম পুরুষ, সুস্থ যুবক তুই। এত লেখাপড়া জানিস। এত বুদ্ধিমান। এরপরেও কি কিছুতেই ভুলতে পারিস না তুই ভিন্ন?"

ফ্যালফ্যাল করে আলতাফের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে যেন জ্বলছিল আলতাফ। তার ঐ রক্তিম মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে খুব বলতে ইচ্ছে হয়েছিল : "আমি? শেষ পর্যন্ত তুইও বলছিস্, আমি ভুলতে পারি না সে কথা?" কিন্তু বলা হয়নি। প্রথম পুরুষ একবাচনিক শব্দটির ওপর যে পরিমাণ জোর দিলে বাক্যটি যথার্থভাবে উপস্থাপিত করা যেত, সে জোর বা ক্ষমতা নিজের মধ্যে খুঁজে পায়নি সে। তাই শুধু বোকার মতো, অবুঝের মতো আলতাফের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আজ কেন জানি সে বারবার হেরে যাচ্ছে। কিছুতেই পারছে না নিজেকে গুছিয়ে একত্রিত করে স্থির একটি কেন্দ্রে নিয়ে বসাতে। হিজড়ার দল আজও নাচছে ধলেশ্বরীর পারে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে দুহাত দিয়ে শাড়ির কুঁচির দুদিক সামান্য উঁচু করে ধরে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে আর মোটা গলায় গান গেয়ে নাচছে ওরা। ওদের চুলের বেণিতে লাল ফিতা দিয়ে ফুল কাটা। গলায় হয় বড়ো বড়ো পুঁতির মালা, না হয় গাঁদা ফুলের উজ্জ্বল সোনালি মালা। কানে ঝুলছে লম্বা কানবালা। কিন্তু আজ ঐ দলে সে নিজেকে কিছুতেই দেখতে পায় না। বরং রাস্তার ধারে দর্শক ও পথচারীদের মধ্যে সে হঠাৎ নিজেকে শনাক্ত করে। ভীষণ রাগ ধরতে থাকে তার হিজড়াদের ওপর। মনে হয় ওদের এ অক্ষমতা,

অপরিপূর্ণতা, এ ভাঁড়ের নাচন, এই সব কিছুর জন্যে ওরাই মূলত দায়ী। কী দরকার কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যা নয় তাই সাজার চেষ্টা করা? বিরক্ত হয়েই ছুটে এসে ঘরে ঢোকে সে।

"রাবেয়া। রাবেয়া এক গ্লাস জল দাও তো?"

প্রচণ্ড ঘামছে সে। খুব গরম লাগছে তার। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে।

"এই যে পানি।" রাবেয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে পুরোটা পান করে ফেলে।

"আপনার শরীর খারাপ হয়নি তো? পাখার নিচে বসবেন?"

মেয়েটির চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

"না চল, বইখাতা নিয়ে এসো।"

কিন্তু আজ শুধু পড়তেই নয়, পড়াতেও মন নেই। বারবার রাবেয়ার দিকে তাকায় সে। হিজড়ারা এখন ক্রমাগত নেচে চলেছে চোখের সামনে। এদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকায় সে। সেখানে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ম্যানহাটানের উত্থিত শিশ্ন।

রাবেয়ার ইংরেজিটা কোনোমতেই ভালো করা যাচ্ছে না। মেয়েটার তো বুদ্ধিসুদ্ধি মন্দ নয়। ইংরেজি গ্রামারটা মাথায় ঢুকছে না কেন? ভিন্ন ভাষাটা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে কিনা কে জানে, সে হঠাৎ রাবেয়ার দুটো গালে দু'হাত চেপে ধরে মেয়েটির সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল নিজের খুব কাছে টেনে আনে।

ম্যানহাটানের মতোই শক্তিশালী ও যৌবনে ভরপুর মনে হয় নিজেকে। হিজড়ারা ভয়ে পালাতে থাকে। খুব পরিতৃপ্ত ও উত্তেজিত বোধ করে সে। যোগেশ কুমোরের খড়ের মূর্তির ওপর নরম পলিমাটির পাতলা আস্তরণ ক্রমে শক্ত জমাট বেঁধে ওঠে। রাবেয়া নিজের দুহাত দিয়ে আস্তে ওর শক্ত হাত দুটো ছাড়াতে চেষ্টা করে। নিচু কণ্ঠে বলে, "মিন্টু চলে আসতে পারে। ও দেখে ফেলবে। ওকে একটু বাজারে পাঠাই কোক নিয়ে আসতে।"

রাবেয়ার ঠোঁটে মৃদু হাসি। লজ্জায় অবনত চোখজোড়া কিছুতেই ওপরে তুলতে পারছে না। উডসাইডের রো হাউজের ঘরে বসে ম্যানহাটানকে ততক্ষণে আবার অনেক দূরের মনে হতে থাকে তার। হিজড়াদের নাচ আর বাদ্য আবার নতুন করে আন্দোলিত করে। সম্মিলিত শব্দের তালে তালে মৃদু দোলে সে। পরিচিত গানের কলিও কণ্ঠে অস্ফুটভাবে গুঞ্জরিত হয়। রাবেয়াকে দ্রুত বলে ওঠে সে, "কাল থেকে তোমাকে আর পড়াতে পারব না রাবেয়া। তোমার আব্বাকে বলো নতুন মাস্টার খুঁজতে।"

# লখিন্দরের বাসর

"কীসের ভয় আপনার?" সাদা লোকটি প্রায় ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের ওপর।

আমি তার দিকে ভালো করে তাকাই। না, মনে হয় না অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। আমার ভয়ের কারণটাই বোধকরি বোঝার চেষ্টা করছে ভদ্রলোক। আমি থুতনির কামানো দাড়ি বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষাঘষি করি। ঘরের উল্টোদিকে আড়াআড়িভাবে বসানো সোফাটির দিকে তাকাই একবার। সেখানে চুপচাপ বসে আছে আমার স্ত্রী ও ছয় বছরের কন্যা। স্ত্রীর হাত দুটো কোলের ওপর একটার ওপর আরেকটা ভাঁজ করা প্রায় হাততালি দেবার ভঙ্গিতে। কন্যাটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পাশের দেয়ালে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশাল পোস্টারটির দিকে।

এ অফিস ঘরটি বেশ বড়ো। পুরো পরিবারের একত্র ইন্টারভিউ নিতে এদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি যে ছিল না, তার প্রমাণ আমাদের তিনজনকেই একত্রে এ ঘরে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু আমারই আগ্রহে বাকি দুজন আপাতত ঘরের অন্য কোণে সোফায় বসে রয়েছে। আমি কিছুক্ষণ একা এই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি।

আমার নীরবতায় ভদ্রলোক চিন্তিত হন। সম্ভবত কিছুটা বিরক্ত।

"আপনি তো বললেন কেনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন আপনি।"

"না, আমি রাজনীতি করি না।"

"দেশে এখন তেমন জরুরি অবস্থা চলছে না। আশপাশের দেশগুলোর অবস্থাও আপাতত শান্ত।"

"তা শান্ত।" আমি বিড়বিড় করে তার কথার প্রতিধ্বনি করি।

"আপনার চাকরি হারাবার ভয় নেই। অর্থকষ্ট নেই।"

"তা নেই।"

"আপনার স্বাস্থ্য ভালো। স্ত্রী-কন্যাও সুস্থ। আপনার সংসারজীবন স্বাভাবিক।"

"সে সবই ঠিক।"

"তাহলে?"

আমি ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকাই। এই 'তাহলে' শব্দটির অর্থ ভালো করে বোঝার জন্যে। স্ত্রী ও কন্যা আমার কথায় কান পেতে আছে মনে হয় না।

তবু ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখটা নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে উচ্চারণ করি : "আমার বড় ভয়। জানেন, সাপকে নিয়ে না আমার ভীষণ ভয়।"

ভদ্রলোক চমকে যান। চোখ দুটো হঠাৎ বড়ো হয়ে আবার ছোট হয়ে পড়ে। তাঁর ফরসা টান টান প্রশস্ত কপালটিতে কয়েকটি সমান্তরাল ভাঁজ পড়ে আবার মিলিয়ে যায়।

"সাপ? ঢাকা শহরে সাপের ভয় করছেন? কোথায় দেখলেন সাপ?"

"যেখানেই যাই, সেখানেই সাপ আমায় তাড়া করে। কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। সাপের ভয়ে আমি বাইরে বেরুতেই ভয় পাই।"

"কোথায় থাকেন আপনি ঢাকায়? আমি তো আজ পর্যন্ত এ শহরে একটাও সাপ দেখলাম না।" লোকটির কথায় অবিশ্বাস। ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্য। আমি একটু বিরক্ত হই।

বলি, "আপনার অফিস বারিধারায়। থাকেন গুলশানে। এসব বড়োলোকের পরিচ্ছন্ন খোলামেলা জায়গায় সাপ তো থাকতে পারে না।"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"থাকতাম তো তাঁতিবাজারে। তারও আগে ছিলাম লৌহজং-এ। উনিশ শ' চৌষট্টি পর্যন্ত। তখন পরিবারের অর্ধেক চলে গেল বারাসাতে। অর্ধেক এলাম ঢাকায়-তাঁতিবাজারে। সাপের তাড়া খেতে খেতে এখন উঠে এসেছি শান্তিনগরে।"

"শান্তিনগরেও সাপ? স্ট্রেন্জ্।"

আমাদের ফিস্‌ফাস্ কথায় স্ত্রীর মনে সন্দেহ জেগেছে। সে দৃশ্যতই উসখুস শুরু করছে। ওর চোখদুটোতে প্রচণ্ড অস্থিরতা অসহায়ত্ব। আঙ্গুলগুলো ফোটাবার বৃথা চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। ঠোঁট দুটোও মুখের ভেতর টেনে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াবার চেষ্টা করল একবার। আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাই।

"সব জায়গায় সাপ। নানান ধরনের বিষাক্ত সাপ। ঢোঁড়া সাপ বলে বিষহীন ভেবে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে দেখেছি, তার ভেতরও দু'-একটা বিষধর লুকিয়ে আছে। প্রতিদিন আমায় ওরা তাড়া করছে। বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরা এগিয়ে না এলে কবে মারা পড়তাম।"

"এমন কি জায়গা নেই, যেখানে সাপের ভয় করতে হয় না আপনাকে?"

"আছে। শুধু একটি জায়গা আছে।"

" কোথায়?"

"আমার ল্যাবে। দরজা জানালা বন্ধ করে ওখানে যখন একবার কাজ শুরু করি সাপের কথা আর মনে থাকে না আমার। সেখানে কোনো সাপ দেখিনি এ পর্যন্ত। ঐ জায়গায় আমি খুব নিরাপদ বোধ করি। কিন্তু ল্যাবে তো আর সবসময় থাকা যায় না। সেখানে খাওয়া ঘুমানো সম্ভব নয়। ল্যাব থেকে বেরুলেই ওরা আবার আমায় তাড়া করে। কিন্তু বেরুতে যে হয়ই আমাকে।"

"তা তো বটেই।" ভদ্রলোক ঢোক গেলেন। "যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করি– আপনি কি এ ব্যাপারে কোনো ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিয়েছেন?"

"বহু বার।"

"তাঁরা কী বলেন।"

"বলেন এটা একটা ফোবিয়া, তাঁরা ভাবেন সাপ হয়ত সত্যি সত্যি দু'একবার আমায় ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তাই বলে সবসময়ে সাপের ভয় করাটাকে তাঁরা আমল দিতে চান না। কেমন করে ওঁদের বিশ্বাস করাব বলুন? সব জায়গায় এত যে সাপ দেখি, সাপকে ভয় করি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সাপ আমায় কামড়ায় নি। আর তাই কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।"

সাদা লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে "এক্সকিউজ মি" বলে একটু পরেই আবার প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাই। কী রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওকে। ওর শ্যামলা রংটা যেন হঠাৎ ফরসা হয়ে উঠেছে। আমার দিকে না তাকিয়েই বলতে শুরু করে। "তোমাকে এত করে বললাম ও কথাগুলো বলো না। কী দরকার ছিল। বললেই হতো আরও বড়ো সুযোগের জন্যে যেতে চাইছ, যেমন সবাই যায়।"

আমার মনে পড়ল কাল সারা রাত পাশে শুয়ে শুয়ে অর্ধাঙ্গিনী এ কথাগুলোই বারবার বোঝাতে চেয়েছে আমাকে। এ ধরনের কত উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয় যে করেছে। ওর কেবল ভয় শেষ মুহূর্তে আমার কথা শুনে ওরা বেঁকে না বসে। এটা ঠিক। আমার স্ত্রীর পরামর্শমতো ঐ কথাগুলোই বলা অনেক বেশি নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত হতো। তবে এটাও আমি ভালো করে জানি, তারা যদি আমাকে নেবার প্রয়োজন বোধ না করে, কোনো কারণেই যাবার অনুমতি দেবে না।

সাদা লোকটি ফিরে এসেছে ঘরে। এবার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করেছে সে। শুরুতে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে অ্যানথ্রোপলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি আছে জানিয়েছিল। অথচ ফিরে এসে হঠাৎ সে জানায়, এবার আমেরিকার সমসাময়িক রাজনীতি ও আমার গবেষণা নিয়ে দু'একটা কথা বলতে চায়। আমি

বুঝতে পারি, ভেতরে গিয়ে আমার ব্যাপারে অন্য কারো সঙ্গে আলাপ করে এসেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক তাই আপাতত মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

"বিল ক্লিন্টন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?" লোকটি টেবিলের ওপর রাখা প্যাডটির ওপর খোলা কলম এমন করে স্থাপন করে, দেখলে মনে হয় আমি যা বলব, তাই নোট করে নেবে। আমার উত্তরের আশায় সোজা মুখের দিকে তাকায় ভদ্রলোক।

"প্রথমে তো মনে হয়েছিল বেশ আনকনভেনশনাল। ভেবেছিলাম আমেরিকার রাজনীতিতে একটা নতুন ধারা আনবেন। সামাজিক কাজকর্মে, শিক্ষাক্ষেত্রে, গবেষণায় টাকাপয়সাও দিচ্ছিলেন বেশ। তাঁর হেলথ কেয়ার রিফর্মের চিন্তা, কালো লোক আর মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো এ সবই খুব ভালো লক্ষণ ছিল। কিন্তু-" আমি একটু থামি।

"কিন্তু"-ভদ্রলোক আগ্রহ সহকারে আমার কথার শেষটুকু শুনতে চান।

"কিন্তু গত পঁচিশ বছরের আর একমাত্র ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মতোই লক্ষ করলাম ক্লিন্টনও বেশ দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। দোদুল্যমানতা বেশি। রক্ষণশীলদের চাপে পড়ে সার্জন জেনারেলকে যে কারণে সরালেন সেটা খুবই দুঃখজনক। আমার কেন যেন মনে হয় বিল ক্লিন্টন এখন যা বলছেন বা করছেন তা দেশ চালাবার চাইতে তাঁর রিইলেকশনের সতর্ক চিন্তা মাথায় রেখেই। এতটা আপসকামী তাঁকে আশা করিনি।"

ভদ্রলোক প্রসঙ্গ ঘোরায়।

"আপনি একটি নতুন কেমিকেল সিনথেসাইজ করে চারদিকে যে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"কী জানতে চান।"

"অনেকে বলছে এই কম্পাউন্ডটি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কার্যকরী হলেও রোগীরও নাকি অনেক ক্ষতি করে ফেলবে। ফলে শেষ পর্যন্ত তেমন কাজে নাকি লাগবে না।"

"মিথ্যে কথা। একেবারে মিথ্যে কথা।" আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি। "হ্যাঁ, এটা হয়ত ঠিক; একটি প্রাণীকে যা ধ্বংস করে সাধারণত অন্য প্রাণীর সামান্য হলেও ক্ষতি বা অস্বস্তি তাতে হয়। কিন্তু তাই বলে একটু অসুবিধের জন্যে মারাত্মক অসুখের চিকিৎসা হবে না? তাহলে তো চিকিৎসাশাস্ত্রই উঠে যাবে।"

আমি একটু জোর দিয়েই বলি, "কেন অ্যান্টিফোলেট দিয়ে ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, সোরায়সিসের চিকিৎসা হচ্ছে না? রোগী তাতে ফোলেট

ডিফিসিয়েন্সিতে সাময়িকভাবে একটু হয়ত ভুগছে। কিন্তু কঠিন অসুখ থেকে মুক্তি তো পাচ্ছে। আসলে কোনটা চাই আমরা? ভিটামিনের অভাবে কয়েকটি দিনের একটু অসুবিধা ভোগ করা নাকি কালব্যাধির কাছে আত্মসমর্পণ? দুনিয়ার কোনো ওষুধই তো সাইড এফেক্টের বাইরে নয়।"

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি বুঝতে পেরে গলা নামিয়ে বলি, "তাছাড়া আমার কম্পাউন্ডটি একটু অভিনবও। এই অ্যান্টিরাইবোফ্লেবিনটি বিশেষভাবে বেছে বেছে শুধু ম্যালেরিয়া জীবাণুর একটি এনজাইমকেই আক্রমণ করবে। এই এনজাইমটি অর্থাৎ গ্লুটাথায়োন রিডাকটেজ আমাদের শরীরেও আছে, আর তার জন্যে রাইবোফ্লেবিনের দরকার। কিন্তু মানুষের এনজাইমটি প্রকৃতিগতভাবে যেহেতু কিছুটা আলাদা, আমার তৈরি এই বিশেষ বস্তুটি কেবল ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের এনজাইমই পঙ্গ করবে। মানুষের তেমন ক্ষতি করবে না।"

"আপনার কম্পাউন্ডটি যে ঔষধের কোম্পানি পেটেন্ট করেছে, আপনি সেখানে অর্থাৎ নিউ জার্সিতে যাচ্ছেন না কেন?"

"শুনেছি, সেখানেও সাপ আছে।"

"আপনার পরিবারের কেউ নেই ওদেশে?"

আমি জানি পরিবার বলতে এরা সাধারণত স্বামী, স্ত্রী, পুত্রকন্যা বোঝায়। বড়ো জোর ভাইবোন। তাই একবার ভাবলাম মাসতুতো বোনটির কথা নাই-বা বললাম। আবার কী ভেবে বলে দিলাম, "আমার মাসির এক মেয়ে আছে মেরিল্যান্ডে।"

"কাজিন" বলতে এত রকমের সম্পর্ক বোঝায় যে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কটা পরিষ্কার করতেই কথাগুলো বলতে হলো।

"আপনি প্রথমে ওখানে যেতে চান না?"

"না।"

"কোথায় যেতে চান তাহলে?"

"হাওয়াইতে। সাদা কালো ওরিয়েন্টাল লোকেরা মিলেমিশে যে চিরবসন্তের দ্বীপ হাওয়াইতে থাকে, যেখানে কোনো সাপ নেই, সেখানেই কেবল যেতে চাই আমি।"

আর আধ ঘণ্টা পরেই বিমান নামবে আমার স্বপ্নরাজ্যে। পাইলট কিছুক্ষণ পর পরই ঘোষণা দিচ্ছে। যেমন আশা করা যাচ্ছিল আজও অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়া হনুলুলুতে। পচাত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রা। অল্প অল্প হাওয়া। বাতাসের আর্দ্রতা বিরক্তিকর নয়। আর কী চাই? এখন পর্যন্ত আসনের পেছনটা সোজা

করতে বলা হয়নি। আমি আরামে চোখ বুজতে বুজতে একবার পাশের জানালা দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরটা দেখে নিই। আজ আকাশে মেঘ নেই। ধূ ধূ করছে কালো জল। ছোটবেলা প্রশান্ত মহাসাগর শুনলেই আমার চোখে ভাসত টলটলে নীল জল। আর আটলান্টিকের কথা বললেই, হয় বর্ষাকালের পদ্মার সব কূল-ভেঙে-ফেলা ঘোলা জলের কথা মনে হতো, তা নইলে বর্ণহীন, টলটলে স্বচ্ছ এক তরল পদার্থ। প্রশান্ত মহাস্যাগর কি অ্যাসলেই নীল? অ্যাটলান্টিকের জল কি রংহীন অথবা ঘোলাটে? আমি জানি না, সবই নিশ্চয় কল্পনা।

ভিসা হাতে পেয়ে নিজের ঘরে আর ফিরিনি। পরম বন্ধুর ঘরটিকেই বেশি নিরাপদ মনে হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে আর সাহস করিনি। সুসংবাদটা শুনেই বন্ধুপত্নী দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে ফেলেছিল। দুটো দিন বলতে গেলে বিছানাতেই কাটিয়ে দিয়েছি। খাওয়াদাওয়া, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কাপড়জামা গোছগাছ করা সবই বিছানার মাঝখানে বসে। আমার মঙ্গলের জন্যে শনির উদ্দেশ্যে উপোসরত বৃদ্ধা মাকে পর্যন্ত চারতলা ডিঙ্গিয়ে ওপরে উঠে আসতে হয়েছিল এখানে। আমি নিচে নামিনি। প্রাকৃতিক ডাকে বাথরুমে যাওয়া ছাড়া খাট ছেড়েও আর নামিনি। কে জানে কোথা ওত পেতে আছে সেই বিষাক্ত সাপ।

বিমানে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি গতকাল। সিঙ্গাপুরে প্লেন থামলেও আমি বেরুইনি। ওখানকার লোকেরা শুনেছি সাপ খায়। কী ভয়ঙ্কর! সিঙ্গাপুর থেকে একবারে টোকিও। বিমান বদল করে সেই যে উঠেছি, নড়িনি সিট ছেড়ে। খাইনিও কিছু। খিদে পাচ্ছে না। ঘড়ি ধরে বসে আছি কখন নামব সেই কাঙ্ক্ষিত মাটিতে।

আস্তে আস্তে প্লেনটি নামছে হনুলুলুতে। হঠাৎ সামনে উড়ে আসা একরাশ মেঘ পার হয়ে যাবার পর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গাঢ় সবুজের ঘেরা প্রত্যাশিত ভূমি। এয়ার হোস্টেসের নির্দেশে আমরা সকলে সিট সোজা করে বসলাম। মেয়েটি এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমার স্ত্রী ওর সিটের পেছনটা সোজা করে দেয়। গায়ের কম্বলটা শেষ মুহূর্তেও জড়িয়ে দেয় মেয়েটির গায়ে। স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ওর চোখে অস্বাভাবিক এক ঝিলিক, ঠোঁটে চাপা হাসি। তৃপ্তির বিয়ের আগের কথা মনে হলো। প্রেমে পড়তে যখন শুরু করেছিলাম আমরা, এরকম উজ্জ্বল দেখাত ওর চোখজোড়া। ইস্। কতদিন ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি। সাপের ভয়ে আমার অন্য সব মানবিক অনুভূতিগুলোও কেমন ভোঁতা হয়ে গেছিল এতদিন। আমি লক্ষ করি দশ বছর পরেও আমার স্ত্রী আগের মতোই লাবণ্যময়ী। গত কয় বছরের কয়েক পাউন্ড বাড়তি ওজন ওকে যেন আরও পরিপূর্ণ করেছে।

রানওয়েতে প্লেন এসে থেমেছে। অনেকক্ষণ ধরেই থেমে আছে প্লেনটি। আর নড়ছে না। অথচ সিট বেল্ট খোলার সংকেতও দেখা যাচ্ছে না। আমি অস্থির হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। এই তো আমার স্বপ্নের দেশ। আমার পূর্ণ বয়সের নির্বাচিত আবাসভূমি। আমি এসে গেছি। শুনতে পেলাম এয়ার হোস্টেস ঘোষণা দিচ্ছে বিশেষ কারণে বিমানটিকে গেটে অর্থাৎ জেটওয়ে পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে না। ফলে সকলকে এখানেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে কয়েক গজ হেঁটে যেতে হবে গেট পর্যন্ত।

আমরা আস্তে আস্তে নিজেদের হাতব্যাগ ও ঝুলি একত্রিত করে বেরুতে উদ্যত হই। দু'চারজন যাত্রী একটু বিরক্তি প্রকাশ করে শেষ মুহূর্তে এরকম একটা অসুবিধেজনক পরিস্থিতিতে পড়ার জন্যে। আমার কাছে এটুকু আয়েশহীনতার কোনো গুরুত্ব নেই আজ। প্লেনের দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে উজ্জ্বল রোদে সেঁকা হনুলুলু বিমানবন্দরকেই একবার স্যালুট জানিয়ে নিই। কন্যার হাত ধরে স্ত্রী নামছে পিছু পিছু। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রানওয়েতে পা ফেলেই, দুটো পা জড়ো করে হাওয়াই দ্বীপের মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কয়েক সেকেন্ড। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই। তারপর আস্তে আস্তে অন্যদের অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

কয়েক গজ দূরে যেতেই একটা জটলা চোখে পড়ে সামনে। অনেকগুলো লোক পরম নিবিষ্ট মনে কী যেন দেখছে রানওয়েতে। আমি আস্তে আস্তে ভিড়টির কাছে এগিয়ে যাই, যদিও আমার সেদিকে যাবার কথা নয়। 'ব্রাউন স্নেক' এই শব্দটি কয়েকবার কানে আসে। আমি আরেকটু কাছে এগিয়ে যাই। লোকজনের মাথার ফাঁক দিয়ে তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাই মাটির দিকে। ডান দিকে রানওয়েতে সিমেন্টের ওপর চোখ পড়তেই দু'পা পিছিয়ে যাই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। সেখানে থেঁতলে পড়ে আছে একট সরু লম্বা বাদামি সাপ। দেখতে আমাদের গ্রামের বাড়ির সিকার বেণি-পাকানো পাটের দড়ির মতো। কিন্তু জখম থেকে নির্গত জৈবরস থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না এটি সত্যিকারের সাপ। যদিও মৃত। মাথার ঠিক পেছনটাতেই জখমের চিহ্ন। চেপ্টা হয়ে গেছে কয়েক ইঞ্চি দেহটা। আমার দিকে তাকিয়ে পাশের লোকটি জানায় কিছুকাল যাবৎ গুয়াম থেকে এরকম করে প্লেনের ইঞ্জিন অথবা চাকায় পেঁচিয়ে বাদামি গেছো সাপ চলে আসছে হাওয়াই দ্বীপে। হনুলুলুর রানওয়েতে চাকার নিচে পিষ্ট ও মৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত এটিই প্রথম সাপ নয়। আশপাশে মাঝে মধ্যে তাজা সাপও দেখা যাচ্ছে আজকাল। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অথবা সেনাবাহিনীর সজাগ দৃষ্টি কিছুই পারছে না গুয়াম থেকে সাপের এই আমদানি রোধ করতে। লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠটা পরিষ্কার করে ফিসফিস করে বলল, "আফ্রিকা

থেকে গরিলাগুলোকে ক্রীতদাস করে এনে দেশটাকে জংলি করা হয়েছিল। এখন এই সাপগুলো এসে সত্যি সত্যিই চিড়িয়াখানা বানাবে এ জায়গাটিকে।" আমি দেখি লোকটার গৌরবর্ণের মুখমণ্ডল রাগে-ঘৃণায় ও হনুলুলুর রৌদে লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে।

ইউনিফর্ম পরা দুটি চাইনিজ চেহারার লোক এতক্ষণ মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একটি লম্বা ফিতে দিয়ে সাপটি ও তার চারপাশে কী সব মাপজোখ করছিল। আরেকজন কৃষ্ণকায় লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাতাতে অনবরত কিছু লিখে যাচ্ছিল। এসময় ভিড় ঠেলে ইউনিফর্ম ও হ্যাট পরিহিত একটি সাদা লোক সামনে এগিয়ে আসে। চাইনিজ চেহারার লোক দুটি ও কালো লোকটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কালো লোকটির হাত থেকে নোটবুকটা টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুলায় আগন্তুক। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে, "নতুন কোনো কিছু?"

"না স্যার।" চোখ নিচু করে কালো লোকটি মাথা নাড়ে। ইউনিফর্ম পরা লোকটি প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে অহেতুক জোরের সঙ্গে খাতাটি কালো লোকটির হাতে আবার গুঁজে দেয়। তারপর চাইনিজ চেহারার লোক দুটোর উদ্দেশ্যে বলে, "এ কাজটুকুর জন্যে কিন্তু সারা দিন পড়ে নেই।" তাড়াতাড়ি সব কাজ গুছিয়ে নেবার কড়া নির্দেশ দিয়ে লোকটি যেমন ঝটিকার মতো এসেছিল, তেমনি প্রবল প্রতাপে টার্মিনালের দিকে এগিয়ে যায়। কৃষ্ণকায় লোকটি তার সহকারীদের সঙ্গে চোখাচোখি করে আবার নীরবে নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করে।

আমি সাপটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাই। আমার স্ত্রী শক্তভাবে দুহাত দিয়ে কন্যাটির ঘাড় চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যে বিমানে করে আমরা এসেছিলাম, দেখলাম তার দরজাটি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। দরজার কাছ থেকে স্থানান্তরযোগ্য সিঁড়িটি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে প্লেনটির গা ছেড়ে।

# মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ

এপ্রিল ১৯৯৫

আজ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত সময়টাকে ঠিক সমান দুভাগে ভাগ করলে যে বছরটা পড়ে, সে বছরেই আমার মা আবার বিয়ে করে। তখন ভরা বর্ষা। আকাশে প্রচণ্ড ঘনঘটা। পুকুর-নদী-নালা একেবারে টইটম্বুর। নববধূর সাজে আবার নতুন করে সাজল আমার মা। সানাই বেজে উঠল। আতশবাজি ফুটল আকাশে। আলোয় ঝলমল করে উঠল বসতবাড়ি। সবুজ আর সাদা কাপড়ে শোভিত হলো প্রবেশপথের উত্থিত দ্বার।

এটা মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে। তাঁর প্রথম স্বামী আমার জন্মদাতা পিতার সংসারে সুখ পায়নি মা। পিতৃপরিবারের কৌলিন্য আর ব্রাহ্মণ্যত্ব মাকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করেছে। তবু এই ছাড়াছাড়ি চায়নি অনেকেই। ধরা যাক চিত্তজেঠুর কথাই। দু'পক্ষকেই কম বুঝিয়েছে সে! ফজলুল চাচার সঙ্গে পরামর্শ করে সমঝোতার মাধ্যমে ঘরটা টিকিয়ে রাখার কত চেষ্টাই না করেছে! চিত্তজেঠু মারা যাবার পরও ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেছে শরৎ কাকু, হাশিম মামা। কিন্তু মা অনড়। অবিচলিত তাঁর সিদ্ধান্তে। অবশ্য মাকে উৎসাহ দেবার লোকেরও অভাব ছিল না। যেমন মনসুর মামা, ইব্রাহিম মাস্টার, নাজিম খালু। তারা মাকে বোঝাত, এই অবহেলা-অপমান থেকে মুক্তি পাবে মা। রাজরানি হয়ে থাকবে সে নতুন সংসারে।

সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারেই বিয়ে হয়েছিল মায়ের। আমি তখন খুব ছোট। ভাই বোন দুটো আমার চাইতে কিছু বড়ো। মা ও তার নতুন স্বামী অর্থাৎ আমাদের নতুন বাবার সঙ্গে চলে এলাম তাঁর নতুন বাড়িতে। প্রথম প্রথম নতুন পরিবেশে সব কিছুই অন্য রকম লাগত। তারপর আস্তে আস্তে ভালো লাগতে শুরু করল। দেখলাম ফজলুল চাচার কথাই ঠিক। এখানকার গ্রামীণ লোকজন বড়ো সহজ সরল, আন্তরিক, বড়ো প্রাণখোলা।

সময় কেটে যাচ্ছিল একরকম মন্দ না। শুধু খারাপ লাগত, কষ্ট হতো', যখন বাড়ির সকলে আমার বাবার পরিবারের নিন্দা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিও তুচ্ছতাচ্ছিল্য দেখাতে শুরু করল। কীরকম কঠিন, নিষ্ঠুর ও অবিবেচকের মতো মন্তব্য করত সকলে! ভাবখানা এরকম, তোমার মায়ের বিয়ে হয়েছে, সে এখানে এসেছে বাড়ির বউ হয়ে, ভালো কথা। তোমরা বাপু আবার কেন এলে? আসলে যে কেন এলাম আমরাও জানি না। বাবার বাড়ির কেউ কি ছাড়তে চেয়েছিল আমাদের? না, একরকম জোর করেই চলে এসেছি, মাকে যে বড়ো ভালোবাসি

আমরা! তা আমাদের অবহেলা করে করুক, কিন্তু ব্যাপারটা যে সেখানেই সীমাবদ্ধ রইল না! এক সময় নতুন বাবাও মায়ের ওপর অত্যাচার শুরু করল। মনে মনে ভাবলাম, মাগো, বিয়ে যখন আবার করেইছিলে, একজন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে সগোত্রীকেই যখন বেছে নিয়েছিলে, কেন একবার দেখে নিলে না সে তোমারই ভাষায় কথা বলে কিনা! তোমরা যে পরস্পরের মুখের কথা পর্যন্ত বুঝতে পার না! তোমার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধই নেই তার। নিজের সংসারে না আছে তোমার একফোঁটা কর্তৃত্ব, না আছে এতটুকু নিয়ন্ত্রণ। তোমার অতীত জীবন নিয়ে যখন তখন নিষ্ঠুর কটু মন্তব্য করে সে। তোমার গায়ে হাত তোলে পর্যন্ত। এ বিয়ে টেকে কী করে?

নিজের খানদানি ও ভাষার গরিমায় সবসময় বিভোর হয়ে থাকতেন আমার নতুন বাবা। আমরা যে আমাদের মায়ের ভাষাতে কথা বলতাম, সেটা খুবই অপছন্দ ছিল তাঁর। নতুন বাবা মনে করতেন ওটা ছোটলোকের ভাষা। সম্ভ্রান্ত লোকেরা ওভাবে কথা বলে না। তাঁর নিজের ভাষাকে ঐশ্বরিক শব্দাবলির মতোই পবিত্র ও শক্তিশালী মনে করতেন তিনি। তাঁর এই অহংকার থেকেই সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটল।

মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর সাড়ে চার বছর কেটে গেছে ততদিনে। ছোট ভাইটি অর্থাৎ বাবার নয়নের মণি সন্তানটি ভয়ানক দুরন্ত হয়ে উঠেছে। ফাল্গুনের প্রথম দিকের এক ঝলমলে দিন ছিল সেটা। কৃষ্ণচূড়ার রক্তাভ লালিমায় আকাশটা আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। শনশনে হাওয়া বইছিল একটু একটু করে। গৃহবধূকে অস্থির ও উন্মনা করে দিয়ে গাছে গাছে কোকিল ডাকছিল অলস সুরে। বাইরে বসে ছোট ভাইটি মনের আনন্দে আধো আধো বোলে আমের মুকুল আর মৌমাছি নিয়ে কী-একটা ছড়া কাটছিল আপন মনে। শুনে পিতার সে কী অগ্নিমূর্তি! যতবার তাকে ও ভাষায় কথা বলতে বারণ করে ততবারই ভাইটি আরও খিলখিল করে হেসে বেশি করে বলে ও কথা। রাগের চোটে বাবা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল ভাইটিকে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল সে। আর ফিরল না সে জ্ঞান। সেদিন ছিল ফাল্গুনের আট তারিখ। পুত্রশোকে মোহ্যমান মা তক্ষনি স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু অনুতপ্ত পিতা ও পরিবারের সকলে মাকে খুব করে বোঝালো, ওটা নেহায়েত দুর্ঘটনা। পুত্রবিয়োগ ও অনুশোচনায় বাবা নিজেও তখন অর্ধ-উন্মাদ। মা তার সকল কষ্ট বুকে চেপে আমাদের কথা ভেবে এর পরেও থেকে গেল এ সংসারে। তবে একটা শর্তে। আমাদের কথাবার্তা নিয়ে কোনো মন্তব্য বা অভিযোগ উঠবে না আর। তা তেমন সরাসরি ওঠেনি ঠিকই। কিন্তু এতে করে বাবার আভিজাত্যের দাপট কমল না

একটুও। তার উচ্চমনস্কতা একসময় এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেল যে সব ধৈর্যের বাঁধন ভেঙে গেল মায়ের। ততদিনে সংসারে এসে যোগ হয়েছে আরও কয়েকটি নতুন ভাইবোন।

আমার মায়ের দ্বিতীয় বিয়েও ভাঙল। ঠিক দুই যুগ পরে। মা এখন প্রৌঢ়া। একদা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, ঝলমলে যৌবনে ভরপুর আমাদের সেই মা কিছুটা ক্লান্তও। দু' দুবার সংসার-ভাঙা, এই ক্রমাগত টানাপড়েন আর ঝড়ঝাপটা মায়ের জীবনশক্তি অনেকটাই নিঃশেষিত করে দিয়েছে। মার পক্ষে সম্ভব হতো না এ অত্যাচারী, বউ পেটানো স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, যদি না আমরা-দুপক্ষের সব ভাই বোনরা, একজোটে মাকে মুক্ত করার ব্রতে বলীয়ান হতাম।

আমার মা এখন আর কারো দাসী নয়। মিথ্যে আভিজাত্য আর বংশমর্যাদার অহংকারে তাকে আর নির্যাতন করার কেউ নেই। আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

প্রথম বছরটা ভালোই কাটল। কিন্তু তারপরেই অবার সম্পর্কের সূক্ষ্ম সুতোয় কোথাও টান পড়ল। সংসারে অভাব। প্রত্যাশিত চাকরির বাজারে দারুণ মন্দা। বন্যায় ভেসে গেছে ফসল। সবচেয়ে বড়ো কথা আমার সৎ ভাইবোনেরাও কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখে আমাদের আজকাল। আমাদের প্রথম পিতার পরিবারের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ রক্ষাটুকুকেও তারা তাদের প্রতি একনিষ্ঠতা ও ভালোবাসার অন্তরায় বলে মনে করে। আমাদের আড়ালে মাকে শাসায় তারা। ভয়ে বাবার বাড়ির কারোর নামটাও উচ্চারণ করি না আর। তবু অভিযোগ, ঘরের মূল্যবান সোনাদানা থেকে চালখড়িও নাকি পাচার করছি আমরা আমাদের বাপের সংসারে। এদিকে আমাদের ছোট ভাই দুটি শুনছি গোপনে গোপনে নানারকম ফন্দিফিকির করছে মাকে তার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে মিল করিয়ে দেবার জন্যে। এরই মধ্যে এ ব্যাপারে চুপিচুপি বার কয়েক পিতার বাসভবনে গিয়ে শলাপরামর্শও করে এসেছে তারা। পিতার ঐশ্বর্য, পিতৃপরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি এই বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার আশু সমাধানের একমাত্র পথ বলে তারা মনে করছে। আর এদিকে তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে তো রয়েছেই সেই দাড়িওয়ালা ভণ্ড বুড়ো গোলাম আর তার কুচুটে দোস্ত মতিউর, যারা মায়ের প্রবল দুর্দশার দিনেও মাকে সব কিছু মুখ বুজে সয়ে স্বামীর পদতলেই বেহেশত আবিষ্কার করতে উপদেশ দিত।

সব দেখেশুনে মায়ের চোখে আবার অবিরল জলের ধারা। দুই স্বামীর কাছ থেকে শুধু নয়, সন্তানের কাছ থেকেও অবিরাম কষ্ট পাচ্ছে আমার মা। নিজের

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ক্রমাগত বচসা, অবিশ্বাস আর ঘৃণা মাকে অস্থির-উন্মনা করে তুলছে। আকাশের দিকে, বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মা সকলের জন্যে উদারতা ভিক্ষা করে। তার প্রার্থনা ফিরে আসে ঝড় আর বজ্র হয়ে। প্রার্থিত শান্তির দেখা নেই।

আমি চাই আমার মায়ের মুখে আবার হাসি ফোটাতে। কী সুন্দর লাগে মাকে, যখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসে। ভাবছি আজ রাতে ছোট ভাইবোনগুলোর সঙ্গে বসব একবার। বলব, অনেক কষ্ট অনেক ঝড়ঝাপটার ভিতর দিয়ে কেটেছে মায়ের জীবন। দীর্ঘ অত্যাচার-অনাচার সইবার পর বহু চিন্তা-ভাবনা করে অবশেষে স্বেচ্ছায় যে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে মা, নিজেদের হীন স্বার্থের কারণে তার সেই সিদ্ধান্ত পাল্টাবার চেষ্টা করা মারাত্মক অন্যায় হবে। বলব, আমরা না হয় তোদের সৎ ভাইবোন, কিন্তু মা তো আপন! আমাদের প্রতি কটু মন্তব্য, কটাক্ষ করলে মা কষ্ট পাবে– শুধু এজন্যেও কি আমাদের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করতে পারিস না? অভিনয় তো একটি শিল্পকলা, অনুশীলনে যাকে আয়ত্ত করা যায়। ভালোবাসা না হোক, অন্তত সহনশীলতা আপনি জায়গা করে নেবে পরিশীলিত অভিনয়ের মাঝখানে। সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছা পুঁজি করে কল্পনা আর বাস্তব জগতের ধূসর সীমানা বরাবর পথ চলতে শুরু করব আমরা। তারপর হয়ত দেখব একদিন অন্তর্গত বোধ আর বাহ্যিক অভিনয়ের পার্থক্য ঘুচে গেছে।

তোরা চেষ্টা করে দেখ। আমিও করি। আর কিছু না হোক, শুধু মায়ের মুখে আবার হাসি ফেরাবার জন্যেই না হয় বড়ো অভিনেতা হবার চেষ্টা করলাম! সকলেই যে মাকে বড়ো ভালোবাসি আমরা!

# একের ভিতরে পাঁচ

এই মায়ের পেটে একত্রে নয় মাস নয় দিন বেড়ে ওঠার পর ওরা জন্মেছিল একই সঙ্গে। শোভা, যুবা, মেধা, যুক্তি আর বোধি।

একসঙ্গে জন্মালেও বোধি বরাবর-ই সবার চেয়ে পরিণত।

একদিকে ওর প্রজ্ঞা, অন্যদিকে স্বার্থতাগের ক্ষমতা, তার সঙ্গে এসে মিশেছে দূরদর্শিতা,—এর যেন আর তুলনা হয় না।

সত্যি বলতে কী, বাকি চারজনকে বোধি প্রায় নিজের মধ্যেই ধারণ করে বসে আছে।

ওদের কল্যাণের কথা ভেবে, ওদের মঙ্গলের জন্যে চিন্তা করে, সারাক্ষণ বোধি ছায়ার মতো ওদের পাশেপাশে থাকে— আগলে রাখে ওদের সমস্ত ঝড়ঝাপটা থেকে।

নিজের শরীর আর বুদ্ধি দিয়ে সকল বিপদ-আপদ থেকে ওদের রক্ষা করে, সর্বক্ষণ পাহারা দেয় ওদের। দেখে মনে হয়, বোধি ওদের সঙ্গে একই সময় জন্মায়নি। মনে হয়, বোধি যেন ওদের অগ্রজা বা জননী, অথবা তারও চেয়ে বড় কেউ।

শোভা আর যুবা ঠিক তার উলটো।

নিজেদের ছাড়া আর কারো কথা জানে না, বোঝে না ওরা।

জন্মের প্রথম দশকে শোভাকে ছাড়া ওদের কারো দিকে কেউ তেমন নজর দেয়নি। যে দেখে শোভাকে, সেই কেবল বলে, 'আহা কী সুন্দর মেয়ে', অথবা, 'বেশ তো দেখতে মেয়েটি'।

যদিও কখনো কখনো কঠিন কঠিন ও দীর্ঘ সব কবিতা মুখস্থ করার পর হাত-পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে ওসব আবৃত্তি করে, অথবা সুর আর তাল মিলিয়ে দু'একখানা গান গেয়ে মেধা যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে কাউকে কাউকে।

কিন্তু সেসব লোকে মনে রাখেনি।

শুধু মনে রাখত তারা, এ বাড়িতে সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে আছে— যার নাম শোভা।

কিন্তু ওদের জন্মের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লোকজনের দৃষ্টি একটু প্রসারিত হলো, অর্থাৎ শোভার সঙ্গে যুক্ত হলো এবার যুবা।

দ্বিতীয় দশকে থেকে চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলল সেই ধারা।

এই সুদীর্ঘ সময়টাতে যৌথভাবে শোভা ও যুবাকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল যতরকম হৈচৈ– মাতামাতি।

লোকজনের মধ্যে, বিশেষ করে পুরুষ মানুষের মধ্যে, রীতিমতো কাড়াকাড়ি, মারামারি লেগে যেত ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, একটু কাছে যাবার জন্যে, সামান্য একটু ছোঁয়া পাবার জন্যে।

সে কী মহা উচ্ছ্বাস, উল্লাস! সে কী উন্মাদনা!

মেধা আর যুক্তির অবস্থান প্রায় সব ব্যাপারেই মাঝমাঝি।

না তারা বোধির মতো সম্পূর্ণ আত্মত্যাগে প্রস্তুত, না তারা শোভা আর যুবার মতো কেবল নিজেকে নিয়ে মশগুল।

শোভা আর যুবার প্রতি সকল মানুষের এমন হুমড়ি খেয়ে পড়া দেখে বেচারা মেধা, এমনকি কখনো কখনো যুক্তিও, বেজায় মনখারাপ করে।

শোভা-যুবার পাশে থেকেও যেন তারা নেই।

লোকে অগ্রাহ্য করে ওদের।

বেজার মুখ করে এককোণে চুপচাপ বসে থাকে ওরা।

আর ভাবে এটা কিছু লোকজনের খুবই অন্যায়।

শোভা আর যুবাই কি সব কিছু? তারা কি কিছুই নয়?

এ ব্যাপারে অবশ্য মন বেশি খারাপ করত মেধাই, যেহেতু শোভা ও যুবার তুলনায় তার অর্জন ও সাফল্যের পাল্লা অনেক ভারী।

কবিতা লেখা, গান করা, নাটকে অভিনয়, ছবি আঁকা, আবার সেই সঙ্গে অঙ্কে একশতে একশ পাওয়া, ইংরেজি ও বাংলা নির্ভুল বানান ও উচ্চারণ করা, এসব কি কিছুই নয়?

যুক্তি যেহেতু খুব অভিমানী নয়, কথায় কথায় সে ভাবাবেগে গাল ফোলায় না মেধার মতো, চলমান সকল ঘটনাকেই নিজে নিজে বিশ্লেষণ করতে পারে যুক্তি। সে শক্তি তার রয়েছে। আর তাই লোকজনের আচরণে দুঃখিত হলেও তাদের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে ওদের ক্ষমা করে দেয় সে।

মেধা কিন্তু পারে না যুক্তির মতো মুহূর্তেই গা ঝাড়া দিয়ে এসব অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে।

তার খালি মনে হতে থাকে, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রে তার অপরিসীম সাধনা ও পারদর্শিতার যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে না এখানে।

সমস্ত ব্যাপারটা এভাবে না ঘটলেই খুশি হতো যুক্তি।

খুশি হতো বোধিও।

কেননা, সত্যি বলতে কী এই প্রবল জনপ্রিয়তার জন্যে শোভা বা যুবাকে কিছুই করতে হয়নি।

কোনো পরিশ্রম, অধ্যবসায় অথবা চেষ্টার মাধ্যমে কোনোকিছু আয়ত্ত, অর্জন বা জয় করেনি ওরা।

যা ঘটেছে ওদের মধ্যে, যা দেখে লোকজন মধু অন্বেষণে ঘোরে ওদের পেছনে, লেগে থাকে আঠার মতো, তা আর কিছুই নয়, স্রেফ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠা।

সন্দেহ নেই, গায়ে-গতরে বড় হয়েছে– বিশেষ বিশেষ স্থানে মেদ-মাংস লেগেছে, মোহনীয় হয়ে উঠেছে ওরা।

বাস্! এ পর্যন্ত-ই।

কিন্তু এ সবই তো ঘটেছে আপনা-আপনি– প্রাকৃতিক নিয়মে। কিছুই তো করতে হয়নি ওদের এজন্যে।

কিন্তু মেধা বা যুক্তির বেলায় তো সেই কথা খাটেনা।

শুধু ঘিলু নিয়ে জন্মালেই চলেনি তাদের, খুলির ভেতর সুরক্ষিত পেলব এই স্নেহজাতীয় পদার্থটিকে আরও জাগ্রত ও উচ্চকিত করে তোলার জন্যে বিভিন্নরকম সুকুমার বৃত্তি ও তর্কশাস্ত্রের চর্চা ও অনুশীলন করে যেতে হয়েছে অনুক্ষণ।

বাইরের জগৎ থেকে পাওয়া ক্রমাগত অবহেলা ও অবজ্ঞা ভুলে, মেধাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যুক্তি, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে।

জেদ করে কোনো লাভ নেই।

যা ঘটেছে, সেটা ঘটাই স্বাভাবিক।

সাধারণ মানুষের কছে এর বেশি আশা করা যায় না।

তবে এটি চিরস্থায়ী হবে না।

দৃষ্টি আবার ঘুরবে, শোভা বা যুবার বাইরেও অনুসন্ধান করা হবে অন্যকিছুর, তবে তা এখন নয়।

আরও বছর পাঁচেক পরে।

ধৈর্য ধরে মেধাকে অপেক্ষা করতে বলে যুক্তি।

যুক্তিকে সমর্থন করে বোধি।

যুক্তি ও বোধির পরামর্শে মেধা অপেক্ষা করে সুদিনের জন্যে, যেদিন তার অর্জিত গুণাবলির দিকে চোখ তুলে তাকাবে মানুষ, স্বীকৃতি দেবে তার বিশেষ কলায় অসাধারণ পারদর্শিতার।

চল্লিশ বছরের ব্যবধানে এই একই জায়গায় আবার এসেছে ওরা। শোভা, যুবা, মেধা, যুক্তি ও বোধি।

চল্লিশ বছর আগে সঙ্গে এসেছিল তখনকার দিনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, কমলা। কমলা এসেছিল সাথে, কারণ সেই বয়সে একা আসার সাহস ছিল না, বাড়ি থেকেও অনুমতি মিলত না। এবার আর সঙ্গে লেজুড় আনা হয়নি। জায়গাটা বেশ পাহাড়ি। বন-জঙ্গলে ঘেরা নির্জন এই ডাকবাংলোয় সেবার ওরা যখন এসেছিল, ভয়ে সারারাত ঘুমুতে পারেনি কেউ। ভয়টা অবশ্য মূলত ছিল শোভা আর যুবাকে নিয়েই। সন্ধ্যায় যখন খেতে গিয়েছিল ডাকবাংলো-সংলগ্ন বাঁশের ঐ সরাইখানায়, কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন লোক বলা নেই কওয়া নেই এসে পাশ ঘেঁষে বসেছিল ওদের টেবিলে। যে আয়োজন ওদের এনেছিল।

এখানে প্রাকৃতিক শোভা দেখাবার জন্যে, সরাইখানার খাবার টেবিলে ওদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেয়ে বাকি রাতের জন্যে সে উধাও হয়ে গিয়েছিল এই বলে যে এ বনের লোকজন বড়ই নিরীহ প্রকৃতির। সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ কম বলেই হয়তো ওরা লোকের ক্ষতি করতে শেখেনি, ওদের নিয়ে কোনো ভয় নেই। আগামীকাল সকালে আবার দেখা হবে বলে বিদায় নিয়েছিল ভদ্রলোক। কিন্তু সে রাতে সরাইখানার টেবিলে গা ঘেঁষে পাশে এসে বসা পুরুষ মানুষগুলোকে তেমন নিরীহ মনে হয়নি ওদের। ভাষা তাদের ভিন্ন, পরস্পরের কথা বোঝা যায় না হয়তো, কিন্তু তাদের চোখ-মুখের আর্তি, আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা, অন্য সব পরিচিত-অপরিচিত ও তথাকথিত সভ্য লোকদের চেয়ে ভিন্নতর কিছু ছিল না। চল্লিশ বছর আগে তখন তারা কৈশোর শেষ করে যৌবন ছুঁই-ছুঁই করছে কেবল। সেই সময়েও শোভা যুবা বনের এই মানুষদের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে প্রথম প্রথম আহ্লাদিত-ই হয়েছিল। একটু প্রশ্রয়ও দিয়েছিল বুঝি। যুক্তি ও বোধির সতর্কবাণীতে একসময় তাদের হুঁস হয়। ততক্ষণে স্থানীয় তাড়ি খেয়ে টলমল দুজন লোক শোভা ও যুবাকে হাত ধরে টানতে শুরু করেছে। মেধা ও যুক্তি লোকদুটোকে বোঝাতে চেষ্টা করে এটা ঠিক হচ্ছে না। মরিয়া হয়ে মেধা একসময় তাদের গান শোনাবার

প্রস্তাব পর্যন্ত দেয়, কেননা আয়োজক ভদ্রলোক জানিয়েছিল, নাচগান বড় পছন্দ করে এ বনের লোকজন। গান শুনলে যদি তাদের মতিগতি অন্যত্র ধাবিত হয়, যদি রেহাই দেয় তারা শোভা আর যুবাকে। কিন্তু মেধার কথা শুনে লম্বা লম্বা দাঁত বের করে হাসে লোক দুটি। মেধার প্রস্তাব অবিকল উচ্চারণে পুনরাবৃত্তি করে ওর কাছেই আবার ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু কোনো আগ্রহ দেখায় না গান শোনার ব্যাপারে। যুক্তি ও বোধি টের পায় তাদের ভাষা ওরা ঠিক-ই বোঝে।

প্রতিষ্ঠিত শিল্পী মেধার গানের প্রতি এতটা অবহেলা বনের বাইরেও কেউ দেখাতে পারে না আজ। অথচ গান-নাচের জন্যে রীতিমতো পাগল এরা কিনা মেধাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল! উপায় না দেখে বোধি ও কমলা সরাইখানার মালিকের হস্তক্ষেপ কামনা করলে, কোনোমতে তার মধ্যস্থতায় অক্ষত অবস্থায় সকলে ডাকবাংলোয় ফিরে আসে সে রাতে। বাকি রাত বলাই বাহুল্য– পুরোপুরি অনিদ্র কাটে তাদের। বাইরে কোনো শব্দ হলেই মনে হয়– এই বুঝি এলো সেই লম্বা লম্বা দাঁতের বিকট হাসির লোকদুটো। যুক্তির অবশ্য এই পুরো ভ্রমণটির ব্যাপারেই আগে থেকে অনেক দ্বিধা ছিল। সতর্ক করে দিয়েছিল সে, এই ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চারে বেরুবার ব্যাপারে, বিশেষ করে সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গায়, পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন এই জঙ্গলে। তার বাড়তি ভয় ছিল যেহেতু এই যাত্রা সদলবলে নয়, কোনো অভিভাবকও যাচ্ছে না সঙ্গে। কিন্তু শোভা, যুবা ও মেধার আগ্রহে আর বিশ্বাসযোগ্য বন-প্রতিনিধির আশ্বাস ও সহায়তায় বোধি অবশেষে রাজি হয়েছিল, যুক্তির কথা একরকম খণ্ডন করেই। সেই রাতে ঘরের ভেতর ভয়ে আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে অবশ্য সকলেই যুক্তির দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছিল। তা সত্ত্বেও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন ঠিকই ওরা বেরিয়েছিল। হাতির পিঠে চড়ে বন, উঁচু-নিচু থ্যাবড়া থ্যাবড়া পাহাড়ি পথ আর পাথরের টুকরো বিছানো হাঁটু অবধি টলটলে জলের প্রবল স্রোতঃশীলা নদী পার হয়ে নিকটবর্তী ভারত-বর্ডার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। যেতে যেতে হাতিচালক জোয়ান ছেলে দুটি বারবার ফিরে ফিরে কেবল হস্তী-আরোহিত শোভা আর যুবাকে দেখছিল। শুধু তো তাই নয়, পথে পনেরো মিনিটের বিশ্রামকালে কাছে থেকে হাতির দাঁত দেখাবার নাম করে শোভা আর যুবার হাতের আঙ্গুল থেকে শুরু করে পিঠ এবং মাথায় পর্যন্ত তারা হাত বুলিয়েছিল। অথচ দুটো ছেলেকে দেখলেই মনে হয়, ভাজা মাছটিও উলটিয়ে খেতে জানে না। এ ধরনের অসভ্যতা ও বেলেল্লাপনায় শুধু বোধি, যুক্তি আর মেধাই নয়, বিরক্ত হয়েছিল শোভা অর যুবা নিজেও।

চল্লিশ বছর পরে এবার যখন সেই একই ডাকবাংলোয় এসে ওঠে ওরা, দেখে শুধু ডাকবাংলো নয়, আগের সেই সরাইখানাটিও ঠিক তেমনি রয়েছে। কেবল বাহ্যিক চেহারার জৌলুস বেড়েছে খানিকটা। এবার স্রেফ বেড়াতে আসেনি ওরা। এসেছে আমন্ত্রিত সংগীতশিল্পী মেধার সঙ্গে। মেধা এসেছে তার জন্যে নির্ধারিত একটা কনসার্টে যোগ দিতে। কনসার্টটা ঠিক এখানে নয়। এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে নিকটবর্তী থানার গা ঘেঁষে টিএনওর বাসার সামনে। বিশাল প্যান্ডেল বেঁধে মহা সমারোহে তার আয়োজন চলছে।

গেল বারের মতো এবারও সন্ধ্যার পর সরাইখানায় গেল ওরা। খরিদ্দারদের চেহারা ও পোশাক-আশাক দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, দু একজন শহুরে লোক ছাড়া বাকি সবাই স্থানীয়। শুধু সরাইখানার ভেতরে নয়, বাইরে আশেপাশে ঘাসের ওপরে বসেও বেশ কিছু পুরুষ-নারী তাড়ি পান করছে। ওদের ঢুকতে দেখে কেউ কেউ এই সন্ধ্যারাতেই ঢুলু ঢুলু চোখে, কেউ কেউ আবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু এই পর্যন্তই। এর পরে আর কেউ ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। এমনকি শোভা বা যুবার দিকেও নয়। সরাইখানায় ঢুকে ওরা কোণার দিকে একটি টেবিলে গিয়ে বসে। তারপর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় ধরে সেখানে বসে পানাহার করে। এবার কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না তাদের দিকে, হাত ধরে টানাটানি করা তো দূরের কথা। কেমন একটা সমীহের দৃষ্টি তাদের চোখে। যুক্তি অবশ্য বলে, সেটা মেধা আর বোধির নিজস্ব কল্পনা। আসলে সম্মান নয়, একটা প্রচ্ছন্ন অবহেলা ও অবজ্ঞা কাজ করছে এই আচরণের পেছনে। বোধি অবশ্য এরকম বহিঃপ্রকাশে বেশ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। ওরা তো গেল বারের মতো যন্ত্রণা করছে না তাদের!

শোভা ও যুবার দিকে ভালো করে তাকায় বোধি। ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু এখনও যথেষ্ট সুশ্রী। তবে ভালো করে তাকালে বোঝা যায়, প্রসাধনের নিচে চামড়ায় এখানে সেখানে শিথিলতা এসেছে, কপালে পড়েছে দৃশ্যমান ভাঁজ। ঠোঁটের দুই পাশে গাল ও চিবুকের মাঝখানে একাদশীর চাঁদের মতো বাঁকা রেখা এখন স্পষ্ট। হাসতে গেলে রেখা দুটো আরও গভীর, আরও পরিষ্কার হয়। চোখের ওপরে আর ভুরুর নিচে ছোট্ট মাংসপেশি ঋজুতা হারিয়ে কিছুটা ঝুলে পড়েছে চোখের পাপড়ির ওপরে। টেবিলের ওপর রাখা হাত দুটি অনুসরণ করে বাহু পর্যন্ত এলে লক্ষ করা যাবে, বাহুর মাংসপেশি আগের মতো পেলব আর দৃঢ় নেই। চামড়া থেকে মাংস আলাদা হয়ে এসেছে ওপরের বাহুতে। আসলে চামড়া আর মাংসের মাঝখানের বেশ খানিকটা মেদ গেছে উধাও হয়ে। ফলে টেবিলে

হাতজোড়া রাখার জন্যে বাহুর যে অংশটা শূন্যে ঝুলে আছে, সেখানে মেদ-মাংসহীন কিছুটা পাতলা চামড়া তির তির করে নড়ছে বাতাসে। ক্রিম মাখার পরেও হাতের ওপরকার চামড়ার শুষ্কতা কমেনি। সেখানে হানিকম্বের ডিজাইনে সহস্র ছোট ছোট ভাঁজের চিহ্ন।

খেয়েদেয়ে ডাকবাংলোয় ফেরে ওরা একটা ফুরফুরে মন নিয়ে। আগের বারের মতো সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা নেই, এই বুঝি ওরা এলো, এই বুঝি কেউ কাছে এসে সখ্যতার নামে হাত দুটি জড়িয়ে ধরল। এবার ট্রেনে আসার সময়ও খুব নিঃসংকোচে দাপটের সঙ্গে আসতে পেরেছে ওরা। সেকেন্ড ক্লাস বগির অন্য লোকগুলো বিরক্ত করেনি আগের বারের মতো। যুক্তি ও বোধি ভাবে, পুরুষদের স্বাধীনভাবে দিনে-রাত্রে যেখানে খুশি সেখানে চলাফেরার অধিকার ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে একদিন যে ঈর্ষান্বিত ছিল তারা, সেই অধিকার, সেই গ্রহণযোগ্যতা অবশেষে আজ নিজেরাই অর্জন করেছে তারা। সর্বক্ষণ নিজের শরীরকে পাহারা দিতে হয় না আর। এজন্যে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে যদিও। সত্যি বলতে কী, শোভা বা যুবার চাইতে মেধার গানের প্রতি লোকের আগ্রহ অনেক বেশি এখন।

মুক্তির আনন্দে ভরপুর পঞ্চমা ডাকবাংলোর বারান্দায় চেয়ার টেনে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকে। খোলা দখিনা বাতাস লুটোপুটি খায় ওদের চুলে, শাড়ির আঁচলে, পায়ের পাতায়। এই স্বাধীনতাবোধ, এই মুক্তির আনন্দ এর আগে এমন করে কখনো অনুভব করেনি ওরা। যে শরীর এতদিন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অনেক হাল্কা লাগছে আজ। প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে চোখ বোজে ওরা।

রাত্রি শেষ হতে চলল। কিন্তু ঘরের ভেতরে যাবার নাম নেই। বারান্দার বেতের চেয়ারে ওভাবেই বসে থাকে ওরা। পাশ দিয়ে কথা বলতে বলতে অথবা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে স্থানীয় লোকেরা ঘরে ফিরছে। দেখতে দেখতে শেষ লোকটিও ঘরে ফিরে গেল। তারপরেও বসে রইল ওরা। মেধা তার গানের খাতাটি নিয়ে আসে, তারপর একটার পর একটা গান গেয়ে যায় যেগুলো আগামীকাল টিএনওর বাসার সামনে প্যান্ডেল করা বিশাল জলসায় গেয়ে লোকদের মাতিয়ে দেবে মেধা।

হঠাৎ একটা কথা মনে আসে, অদ্ভুত একটা কথা মনে আসে বোধির। না, আগের সেইসব দুঃসহ অভিজ্ঞতার কিছুই ভোলেনি তারা। যেখানেই গেছে, যাই করেছে সবসময় ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়েছে। স্বাভাবিক হতে পারেনি।

বিশেষ করে কোনো ভিড়ে, পালাপার্বণে, রেল স্টেশনে, সিনেমা বা নাটক শেষে গেট দিয়ে বের হবার পথে। সুযোগ পেলেই শরীরের বিশেষ স্থানে কারো না কার হাত পড়বেই, ভিড়ের চাপে যাকে ধরার কোনো উপায় নেই। আর অন্য সময়, দৈনন্দিন জীবনে, আর কিছু না পারুক, ঐসব লোক কতবার যে শুধু দৃষ্টি দিয়ে, মুখগুলোর অভিব্যক্তি দিয়ে একেবারে কেটে-ছিঁড়ে খেতে চেয়ে ওদের! সব সত্ত্বেও মনে হয়, একান্ত চুপিচুপি করেই কথাটা মনে আসে, আহা, যদি কোনোভাবে আবার চল্লিশ বছর আগের সেই দিনটিতে ফিরে যাওয়া যেত! শোভা, যুবা, মেধা ও যুক্তি, প্রত্যেকে বৈচিত্র্যময় শ্বাসরুদ্ধকর সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে না। নিজেদের গুটিয়ে তারা বোধির এই অন্তিম বাসনার কাছে পুরোপুরি সমর্পিত হতে চায়।

সকাল বেলা ডাকবাংলোর মালী এসে দেখে, মেমসাব ঘুমিয়ে আছে বারান্দার চেয়ারে। তার দীর্ঘ চুল উড়ছে বাতাসে। তার দুটো হাত টেবিলের ওপরে উপুড় করে রাখা। চেয়ারে বসে সেই হাতের ওপরে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে আছে মেমসাব। তার শূন্যে ঝুলন্ত বাহুর কিছুটা অংশ থেকে মেদ-মাংস আলাদা হয়ে যাওয়ায় পাতলা একটা চামড়ার পর্দা বাতাসে তিরতির করে নড়ছে। টেবিলের অন্য পাশে খোলা গানের খাতাটা উলটো করে রাখা। গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে মেমসাব। পুরনো মালী। বহুকাল এখানে কাজ করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবে মালী, এমন সুন্দর গতর, এমন মিষ্টি গানের গলা আর এতসব বিদ্যা-বুদ্ধি গুণ নিয়ে সারাটা জীবন এভাবে একা একাই পার করে দিল মেমসাব!

# সে তখন উল্টো করে জামা পরত

অবশেষে সে এলো। যাকে নিয়ে এত গুঞ্জন।

একটু তাড়াহুড়ো করেই ঘরে ঢুকল সে। সকাল থেকেই সকলে তার কথা বলাবলি করছিল। উল্টো করে জামা-পরা সেই ব্যক্তি।

আমি : আপনি কি জানেন আপনি উল্টো করে জামা পরে আছেন?

লোক : জানি।

আমি : তার মানে এটা ইচ্ছাকৃত। কেন এটা করেন? লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে?

লোক : না।

আমি : আপনি কি জামার ভেতরটা বাইরে দিয়েই শুধু পরেন, নাকি পেছন দিকটাও সামনে এনে পরেন?

লোক : না। কেবল ভেতরেরটা বাইরের দিকেই পরি।

আমি : লোকে বলে, আপনি উল্টো জামা পরেন কেননা এক দিক যখন ময়লা হয়ে যায়, তখন আপনি উল্টো করে অন্য দিকটা অর্থাৎ পরিষ্কার দিকটা বের করে পরেন।

লোক : কখনো নয়। আমি সবসময় পরিষ্কার কাপড় পরি। অপরিচ্ছন্ন থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। অপরিষ্কার জিনিস আমি খুবই অপছন্দ করি। সেটা বাইরে বা ভেতরে যে-দিকেই থাক।

আমি : আপনার এই উল্টো করে কাপড় পরা, আপনার অগোছালো স্বভাবের চিহ্ন বলে মনে হতে পারে লোকের কাছে। মনে হতে পারে আপনি যথেষ্ট সতর্ক নন।

লোক : আমি যেহেতু সোজা করে কখনো কাপড় পরি না, এটা বেখেয়ালি বা অগোছালো স্বভাবের উদাহরণ হতে পারে না।

আমি : আপনার নামটা বেশ অন্যরকম। ছেলে কি মেয়ে, কোন ধর্মের, কোন দেশের কিছুই বোঝার উপায় নেই। এটা কি আপনার আসল নাম, নাকি নিজেই পালটিয়ে নিয়েছেন?

লোক : দুটোই। অর্থাৎ কিছুটা আসল নাম রয়েছে। বাকিটা জুড়েছি।

আমি : আপনি ধর্মের জায়গায় লিখেছেন, নেই। অর্থাৎ আপনার কোনো ধর্ম নেই।

লোক : না, নেই।

আমি : অর্থাৎ আপনি কোনো ধর্ম তেমনভাবে চর্চা করেন না। এই তো? তা আমরা হয়তো অনেকেই করি না। কিন্তু আপনি আসলে কী? মুসলমান?

লোক : না।

আমি : হিন্দু?

লোক : না।

আমি : খ্রিস্টান?

লোক : না।

আমি : বৌদ্ধ?

লোক : না। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধর্ম বেছে নেওয়ার যদি বাধ্যবাধ্যকতা থাকত হয়তো এটাই নিতাম। কিন্তু আমি আসলেই কোনো ধর্ম মানি না।

আমি : আপনি কি কমিউনিস্ট?

লোক : না।

আমি : আওয়ামী লীগার?

লোক : না।

আমি : তবে কি বিএনপির সমর্থক?

লোক : জ্বি না।

আমি : জাতীয় পার্টির হতে পারেন কি?

লোক : অসম্ভব।

আমি : আপনি নিশ্চয়ই জামাতে ইসলামী নন?

লোক : না। অবশ্যই না।

আমি : আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা বলবেন?

লোক : যে-রকম বিশ্বাস করি, সে-রকম কোনো দল নেই। অন্তত আমার জানা মতে।

আমি : আপনি এসএসসি পাস করেছেন হিউম্যানিনিটিজ-এ!

লোক : জ্বি। আর এইচএসসি সায়েন্স।

আমি : ব্যাচেলর দেখছি কমার্সে।

লোক : হ্যাঁ, আর মাস্টার্স করেছি সংগীতে।

আমি : এত বেশি কেন পরিবর্তন করেছেন? মন স্থির করতে পারেন না, নাকি ভালো লাগে নি যা পড়তেন?

লোক : মনস্থির করেছি বলেই তো পড়ার বিষয় পাল্টিয়েছি। আসলে, যখন যেটা পড়েছি ভালোই লেগেছে। রেজাল্টও বরাবর ভালো করেছি। কিন্তু এক একটা ধাপ শেষ হতেই মনে হতো ওটা আর নয়। নতুন কিছু করি।

আমি : এখন কি সংগীতেই থাকবেন?

লোক : সংগীত আমার ভালো লাগে। কিন্তু এখন বুঝি, তার জন্যে মাস্টার্স ডিগ্রি করার কোনো দরকার ছিল না। সংগীতের চর্চা করব। তবে এ বিষয়ে একাডেমিক পড়াশুনা আর করব না।

আমি : আরও পড়াশুনো করার ইচ্ছে আছে কি?

লোক : আছে।

আমি : কী পড়তে চান?

লোক : নতুন নতুন ভাষা শিখতে চাই। বেশি তো পারব না। তিন চারটে আর কি? যেমন এখন শিখছি স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ। এরপর শিখব জাপানিজ ও রাশান। জার্মান ভাষাটা মোটামুটি আগেই শিখেছিলাম। আসলে ভাবাই যায় না। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের– মেজরিটি লোকেরই কথা বুঝতে পারি না আমরা, অথচ তাদের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে ভাব-বিনিময়ের একটাই উপায়। তাদের ভাষায় কথা বলা। তৃতীয় কোনো ভাষা দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। হতে পারে না। ভাবতে পারেন কত কিছু আমাদের অজ্ঞাত রয়ে যাচ্ছে, শুধু কয়েকটা ভাষা না জানার জন্যে?

আমি : দেখুন, আপনি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। নিজেও নিশ্চয়ই সেটা জানেন। তবে আপনি বেশ ইন্টারেস্টিং। আপনি বুদ্ধিমান, গুণী, সবই সত্য। কিন্তু এটি তো একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এখানে যারা কাজ করে, তারা অধিকাংশই নির্ধারিত কতকগুলো সামাজিক নর্‌ম্‌সের মধ্যে ওঠাবসা করে। এরই ভেতর উনিশ-বিশ হয়। এতগুলো ব্যতিক্রম নিয়ে আপনাকে আমাদের প্রতিষ্ঠান আমাদের লোকজন গ্রহণ করবে না। এই চাকরিটা পেতে হলে কিছু আপনাকে ছাড়তেই হবে। বলুন তো ধর্মের প্রতি আপনার মনোভাব, আপনার নাম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আপনার পড়াশুনার বিষয়, উল্টো করে জামা পরা– এর মধ্যে অন্তত একটি ছাড়তে হলে কোনটি ছাড়তে রাজি আছেন আপনি?

লোক : উল্টো করে কাপড় পরার অভ্যেস।

আমি : এত সহজে বলে দিলেন? যারা আপনাকে চেনে, তারা তো বলে এটা আপনার বহুদিনের অভ্যেস। আর এটা নাকি কোনোমতেই ছাড়তে পারবেন না আপনি !

লোক : বাইরে থেকে লোকেরা কত কিছুই তো বলে। ভাবে। আমাকে তারা কতটুকু জানে? আমি কী ভাবি, তারই-বা কতটুকু খবর রাখে তারা?

আমি : তাও বটে।

লোক : আপনাকে একটা সত্য কথা বলব? আমার এই উল্টো করে জামা পরা, এটার শুরু কিন্তু পরিকল্পিত ছিল না। কেমন করে ঘটনাচক্রে এটা শুরু হলো জানেন?

আমি : জানি না, কিন্তু শুনতে আগ্রহী।

লোক : আমি তখন বিদেশে। চাকরি পেলাম এক ফ্যাক্টরিতে। ভোর রাতে উঠে ট্রেন ধরে যেতে হয় কাজে। ঘরে রুমমেট। তার ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে অন্ধকারেই কাপড় পরে বেরুলাম। ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখি উল্টো করে কাপড় পরে এসেছি। সহকারীরা এ ওকে দেখাচ্ছে আমায়। আমাদের ফ্যাক্টরিতে প্রচুর উপমহাদেশের লোক। আমার ডাকনামেই আরও তিনজন কর্মচারী রয়েছে। দেখলাম সবাই আমার নামের আগে আগে রিভার্স শব্দটা যোগ করে দিয়ে আমাকে অতি সহজে চিহ্নিত করছে। আমি দেখলাম, এটা তো বেশ। এই সামান্য একটু পোশাকের পরিবর্তন করে এতগুলো মানুষের যদি সুবিধে করে দেওয়া যায়, অনেক কনফিউশন কমিয়ে দেওয়া যায়, কেন তবে প্রতিদিনই উল্টো করে জামা পরে আসি না? সেদিন থেকে আর কখনো সোজা করে জামা পরিনি। তবে দেশে ফেরার পর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। কিন্তু জামা আর সোজা করে পরা হলো না আমার।

আমি : মানে?

লোক : মানে উল্টো করে জামা পরার ফলে এখানে যে কৌতূহল, যে কৌতুক মানুষের চোখেমুখে জমা হতে দেখলাম, যে আগ্রহের সঙ্গে, যে গভীরভাবে তারা আমায় দেখতে শুরু করল, মনে হলো বন্য বাঘকেও চিড়িয়াখানায় কেউ এমন করে দেখে না। বিশেষ করে শিশুরা আমাকে দেখে যেরকম হেসে লুটোপুটি খেতে শুরু করল, আমার দিকে তাকিয়ে যেরকম পরস্পরের চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মজা পেল, হাজারো প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল আমায়, তাতে মনে হলো

ঢিলেঢালা পলকা ডটের পোশাক না-পরেও, মুখে সাদা রং আর নাকে লাল বল না ঝুলিয়েও, লম্বা রঙিন টুপি মাথায় না দিয়েও আমি আসলে একজন সার্কাসের ক্লাউনের ভূমিকাই পালন করছি। এটুকুই বা কেড়ে নিই কেন ওদের কাছ থেকে যেখানে আনন্দের উৎস এত কম চার ধারে?

আমি : কিন্তু এখন যে নিচ্ছেন?

লোক : নিচ্ছি এজন্যে যে, অন্যগুলো আরও গভীরের ব্যাপার। ওগুলোর কোনোটাকে ছাড়তে হলে আমি আর আমি থাকব না। অথচ চাকরিটা আমার বড়ো দরকার। বাচ্চাদের বিনোদন আমাকে দিয়ে যতটুকু সম্ভব, তার সবটুকুর পূর্বশর্তই কি আমার বেঁচে থাকা নয়?

আমি : তা তো বটেই।

লোক : তাছাড়া আমাকে অতটা আত্মকেন্দ্রিক ভাববেন না। এই সমঝোতার মাধ্যমে আমি নিজেও কম স্বার্থত্যাগ করছি না কিন্তু। এই ধরুন, উল্টো করে জামা পরতে পারতে আস্তে আস্তে একটি জিনিস আমি ভালোভাবে টের পেয়েছি। সেটা হলো, জামার সেলাইগুলো বাইরের দিকে থাকায় শরীরে তা মোটেও বেঁধে না। কীরকম নরম, মসৃণ লাগে তা পরতে। উল্টো করে জামা পরার যে কী আরাম, কী আনন্দ, আপনারা যারা সব সময় সোজা করে পরেন, কোনো দিন তা বুঝবেন না।

# হিরের আংটি ও আঙ্গুরবালা

আমার বিয়েতে আমার শ্বশুর তাঁর কন্যাকে এবং আমার পিতা তাঁর আংটিটি আমাকে দান করেছিলেন।

কন্যাটির নাম আঙ্গুরবালা। স্বনাম নির্বাচনে নিজের ভূমিকা অনুপস্থিত— কেবল এই সত্য আঙ্গুরবালাকে আধুনিকা প্রমাণ করে না। প্রকারান্তরে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ঐ কাদম্বরী আঙ্গুরবালা ধরনের নাম পুনঃপুন ঝঙ্কৃত হয়।

আংটিটি হিরের। বাবার বিয়েতে পাওয়া তাঁর সবচেয়ে শখের বস্তু।

আমার কাছে অবশ্য আঙ্গুরবালা ও হিরের আংটি উভয়েই অত্যন্ত প্রিয়। আঙ্গুরবালার রূপ, গুণ, পারিবারিক ইতিহাস এবং হিরের আংটির আকার, প্রকৃতি ও স্পেশাল কাট্ আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লোককে বুঝিয়ে বলি। বন্ধুরা যখন ঈর্ষার চোখে আঙ্গুরবালাকে দেখে অথবা আংটিটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, আমি শার্টের কলারটা ঝেড়ে গলায় খুক্‌খুক্ আওয়াজ তুলি। স্বভাবতই গর্ব হয় আমার। আঙ্গুরবালা ও হিরের আংটি দুটিই আমার অহংকার।

আমি আমার সম্পদ সযতনে রক্ষা করে চলি। তাদের নিরাপত্তা, তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে আমার চিন্তার শেষ নেই। তাই নিজের মনমতো করে গড়ে নিতে আঙ্গুরবালার থেকে কিছু কাটছাঁট করতে অথবা ওতে কিছু কিছু জিনিস জুড়ে দিতে আমি মোটেও ক্লান্তি বোধ করি না। ঠিক তেমনি করে আংটিটির একটি কোণার পরিচর্যা বা সংস্কারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে আমার খারাপ লাগে না। কোনো জায়গা নড়বড়ে মনে হলে সেটার কারণ অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে আমি সোজা মেরামতে লেগে যাই— ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

সেদিন বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে আমি যখন আংটিটি বাক্স থেকে খুলে চোখের সামনে তুলে ধরলাম ওর ঔজ্জ্বল্যে চাকচিক্যে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। বুঝলাম যত্ন, পরিচর্যা একটি বস্তুকে কত সুন্দর করে দিতে পারে। অথচ সেই মুহূর্তে বারান্দায় বেরিয়ে আমি যখন আঙ্গুরবালার দিকে তাকালাম, দেখি উজ্জ্বলতা নয়— দুচোখের কোণে কালি আঙ্গুরবালার। চেয়ারে গা এলিয়ে পরিপূর্ণ চাঁদের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিল সে। হাওয়ায় শাড়ির আঁচল, চুল উড়ছিল তার। চাঁদের স্নিগ্ধতায় আমি আঙ্গুরবালার মুখে ক্লান্তি দেখলাম এটাই প্রথম বিস্ময়।

হাত ধুতে গিয়ে সেদিন আংটিটি হঠাৎ আমার আঙ্গুল থেকে খুলে পড়ে গেল বেসিনে। কিছু বোঝার আগেই জলের স্রোতে তা গড়িয়ে চলে গেল পাইপ বেয়ে। আমি অশান্ত হয়ে উঠলাম। বেসিন এবং যাবতীয় জলের কলের ব্যবহার বন্ধ করে প্লাম্বার ডাকিয়ে কয়েক ঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রমে আংটিটি ফিরে পেলাম। আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। কেননা বুঝলাম আংটিটি নিজের ইচ্ছেতে নয়– আমারই অসাবধানতায় হারাতে বসেছিল। অথচ কী আশ্চর্য! শুধুমাত্র জলস্রোত চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ রেখেই ওর চলাকে থামিয়ে দিয়েছি আমি। নিজেকে ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী মনে হলো।

কিন্তু যেদিন ঘরে ঢুকে আঙ্গুরবালাকে পেলাম না– যখন সর্বত্র খুঁজে, মাথা কুটেও পারলাম না তাকে ফিরিয়ে আনতে আমি আবার ড্রয়ার খুলে আংটির বাক্সটি বের করলাম। অত্যাশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য নিয়ে যথাস্থানে আংটিটি শোভা পাচ্ছে। ঠিক আগের মতো। আঙ্গুরবালাই শুধু নেই।

এটা আমার দ্বিতীয় বিস্ময়।

# ঈশ্বর ও নারীর পরিবার-পরিকল্পনা

ভুবন প্রস্তুতের পরে ধীরে ধীরে ঈশ্বর পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, ফুল, ফল, বিস্তীর্ণ বনভূমি একে একে সবই তৈরি করেন।

মনের মতো করে একটু একটু করে বিভিন্ন জিনিস গড়েন আর সেসব দিয়ে সাজাতে থাকেন তাঁর নবীন সৃষ্টিকে– যেখানে যেটা দরকার, যতটুকু দরকার।

অবশেষে ঈশ্বর নেমে আসেন সাতচূড়া স্বর্গের গিরিশৃঙ্গ থেকে পৃথিবীর বুকে।

নিজের চোখে দেখতে চান প্রকৃতই পরিপূর্ণতা পেয়েছে কিনা তাঁর মহান ও সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

দেখে পরিতৃপ্ত নন ঈশ্বর। সন্দেহ নেই, তাঁর সাগরেদদের কথিত সুগঠিত ও সুদৃশ্য প্রকৃতি আসলেই নয়নাভিরাম। নিচে ঘন সবুজ ধরিত্রী। ওপরে গাঢ় নীল আকাশ। মাঝে মাঝে সুনীল টলটলে বিশাল সমুদ্র আর দূরে দূরে গগনচুম্বী পাহাড় ও গিরিশৃঙ্গ, মাঝখানে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। চারদিকে সমস্ত কিছুই এত ছিমছাম, এত সাজানো-গোছানো! শান্ত। নিরিবিলি। কিন্তু এসব দেখার, ভোগ করার তো কেউ নেই।

অতএব, ঈশ্বর একজন মানুষ তৈরি করলেন। একজন পুরুষ মানুষ।

কিছুদিন পর ঈশ্বর টের পেলেন পুরুষটি বড়ই নিঃসঙ্গ। তাছাড়া প্রকৃতিতে ছড়ানো-ছিটানো জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কেবল খুঁজে নেবার আগ্রহ বা চেষ্টার অভাবে কিংবা দরকার মতো কোনো বস্তু বা সামগ্রী সামান্য রদবদল করে নিজ উপযোগী করে তোলার ধৈর্যের অভাবে বিনা আহারে বা অর্ধাহারে এবং বিনা বাসস্থানে বড় ক্লেশে দিনাতিপাত করছে পুরুষটি।

অতএব ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন একজন নারী, যে শুধু সঙ্গই দেবে না পুরুষটিকে, নারী তার দিবারাত্রির পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের মাধ্যমে এই নবসৃষ্ট ভূমিটিকে আবাসযোগ্য করে তুলবে– তার নিজের এবং পুরুষটির উভয়ের জন্যেই। সেই সঙ্গে প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণের অপচয় রোধ করবে, সামান্য যেটুকু জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজন সেটুকু শুধু গ্রহণ করে বাদবাকি বিপুল সামগ্রী আবার প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দিয়ে। এরপর থেকে সুখেই দিন অতিবাহিত করতে থাকে নারী-পুরুষ। একত্রে খাদ্যের অন্বেষণে বেরোয় তারা। তারপর নানান ফুল, পাতা, লতাগুল্ম, গাছের বাকল দিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরি করে নারী। পরিবেশন করে পুরুষকে।

তাকে পেট পুরে খাইয়ে সে নিজেও অবশিষ্ট আহার গ্রহণ করে। মধ্যদুপুরের প্রচণ্ড রোদ্দুর আর মুষলধারে বৃষ্টির ছাট থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গাছের কাণ্ড, বাকল, পাতা আর শুকনো লম্বা ঘাসের ডগা দিয়ে মাথার ওপর তৈরি করে পুরু আচ্ছাদন।

হঠাৎ ঈশ্বরের খেয়াল হয়, মাটির পৃথিবীতে যেহেতু প্রাণসঞ্চার করা হয়েছে এই নারী-পুরুষের, তাদের নির্দিষ্ট ও সীমিত আয়ু রয়েছে। ফলে মৃত্যুর আগে ওরা যদি আরও কিছু মানুষ পৃথিবীতে রেখে না যায়, আবার মনুষ্যবিহীন হয়ে পড়বে পৃথিবী! কিন্তু, প্রশ্ন বা সমস্যা হলো– এই কঠিন সংগ্রামময় ও সীমিত সম্পদময় জীবনে নারী বা পুরুষ কেন মিছেমিছি আরও নতুন মানুষ আনতে রাজি হবে। এ যে তাদের নিজেদের স্বার্থের বিপক্ষে যাবে! তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ করবে! কিন্তু মানুষের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে, নতুন প্রজন্ম গড়ার জন্যে নারী-পুরুষকে যে উদ্বুদ্ধ করতেই হবে! এর তো কোনো বিকল্প নেই। ঈশ্বর ভেবে পান না কী করা যায় এই ব্যাপারে। অনেক ভেবে তাই ঈশ্বর এমন এক প্রলোভন দেখাতে চাইলেন নারী-পুরুষকে যাতে তারা স্বতোপ্রণোদিত হয়ে সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। ফলে সেদিন থেকে নারীপুরুষকে একত্রে বেঁধে রাখার জন্যে, তাদের পরস্পরের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণের ভিত্তি হিসেবে তীব্র যৌন অনুভূতির সঞ্চার করলেন তিনি উভয় দেহেই। পারস্পরিক এই উপভোগের ফলে নির্মিত হলো তাদের সন্তান-পৃথিবীর নতুন বাসিন্দা। ঈশ্বর সৃষ্টি করেই জানতেন এই বোধ খুব প্রচণ্ড না হলে এবং এর আস্বাদিত আনন্দ অতুলনীয় উপভোগ্য না হলে পুরুষ কেবল তার প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এ বাড়তি কাজটুকু কিছুতেই করবে না, বিশেষত যেখানে খাদ্যের সংকট ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই তো অঙ্কুরিত সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে তার বেড়ে ওঠার আধার যেমন তিনি করলেন নারীদেহে, জন্মের পূর্বে তার নিরাপত্তার দায়িত্বটাও দিয়ে দিলেন ঈশ্বর নারীকেই। আভূমিষ্ঠ শিশু নারীর শরীর বেয়েই বেড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। নয় মাস ধরে মাতৃজঠরে প্রাথমিকভাবে এই বেড়ে ওঠার প্রয়োজন অপরিসীম। এককভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করার আগে প্রতিটি মানবশিশুকেই সেখানে বেঁচে থাকার জন্যে আগেভাগে বেশ কিছু প্রস্তুতি নিতে হয়– যথেষ্ট বলবান ও উপযোগী হয়ে ওঠার জন্যে মায়ের কাছ থেকে বেঁচে থাকার কিছু রসদ সংগ্রহ করতে হয়। আর সেই কাজটায় প্রায় এককভাবে নেতৃত্ব দেয় নারী।

এভাবেই চলে কিছুকাল। মানবকুল রক্ষা পায়। ঈশ্বর নিজেও মহাখুশি। তাঁর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি যে জগৎ, তাকে প্রবল উৎসাহে ভোগ করবার জন্য শীঘ্রই সেখানে

যথেষ্ট সংখ্যায় বিচরণ করতে শুরু করে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। কিন্তু গোল বাঁধে নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে। পুরুষ তার শারীরিক আনন্দটিকে এতটাই নিজের প্রাপ্য ও মৌলিক অধিকার বলে ধরে নেয় যে স্বার্থপরের মতো অন্য কোনো কিছুর দিকে, অর্থাৎ এর ফলাফলের দিকে ফিরেও তাকায় না। এদিকে বছরে বছরে সন্তান ধারণ করতে করতে নারীর অবস্থা সঙ্গীন। ঘন ঘন সন্তানধারণ, বহু সন্তানের জন্মদান ও বছরের পর বছর ক্রমাগত অপুষ্টিতে ভোগা নারীজীবনের স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ঈশ্বর দেখেন তাঁর হস্তক্ষেপ ছাড়া পুরুষের অবিবেচনা ও স্বার্থপরতা নারী জাতিকে সমূহ নির্মূল করে দেবে এবং শেষ পর্যন্ত মানবজাতির ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে উঠবে। ফলে ঈশ্বর তাঁর ব্যক্তিগত দূতের মাধ্যমে দুঃস্থ নারীদের কৌশলে একটা তথ্য জানার সুযোগ করে দেন। আর সেটা হলো, জন্মের পর সীমিত আহার করা ভগ্নস্বাস্থ্যের মায়েরা যদি শিশুকে অন্তত বছরখানেক নিজের দুগ্ধ দান করে, শিশুটি তো সুস্থ এবং বলবান হয়ে উঠবেই, সেই সঙ্গে দুগ্ধদানের সঙ্গে সম্পর্কিত জৈবিক প্রতিক্রিয়ার কারণে মায়ের শরীরের ভেতর যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে, তাতে সে বেশ কিছুকাল পুনরায় সন্তানবতী হবে না। শুধু তাই নয়, শিশুকে নিজের শরীর-নিঃসরিত খাদ্য পরিবেশন করায়, প্রাথমিকভাবে শিশুটিকে বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে না। এতে করে প্রকৃতির ভারসাম্য যেমন বজায় থাকবে, গৃহের আর্থিক স্বচ্ছলতাও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। রোগজীবাণু থেকে রক্ষা পাবে শিশু। এই তথ্য জানার পর গরিব, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুসন্তানের জননীরা অন্তত কিছুকালের জন্যে তাদের নতুন করে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পায় কেবল শিশুসন্তানকে নিয়মিত ও ক্রমাগত নিজের বুকের দুগ্ধ পরিবেশন করে।

ইতোমধ্যে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যে অতি পরিষ্কারভাবে দুটি অসম শ্রেণির অভ্যুদয় হয়– এক শ্রেণি প্রবল ধনী, আরেক শ্রেণি ভয়ানক গরিব। ধনী দেশের ধনী সরকার এবং জনগণ তাদের ক্ষমতা, বিত্ত ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশায়, মানবিকতার নামে, গরিব রাষ্ট্র ও গরিব মানুষদেরকে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে ও খাবার-দাবার পাঠাতে শুরু করে। আর সেই সুযোগে সেই ধনী দেশেরই একদল বিজ্ঞানী তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখাতে সচেষ্ট হন, অর্থ না খাদ্য কোন প্রকার দান অপুষ্টি রোধে বেশি সক্ষম বা কার্যকরী। এই গবেষণা করতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে তারা আরও আবিষ্কার করেন যে, বাইরে থেকে সরবরাহকৃত পুষ্টিকর খাবার অপুষ্টিতে ভোগা দুগ্ধদানরতা শিশুসন্তানের জননীদের পুষ্টিই কেবল বাড়াচ্ছে না, তাদের পরবর্তীতে পুনরায় গর্ভবতী হবার সম্ভাবনাকেও ত্বরান্বিত করছে এবং দুই সন্তানের মাঝখানের প্রাকৃতিক বিরতিকালের দৈর্ঘ্য ঘুচিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ শিশুকে দুগ্ধদান করে প্রাকৃতিক উপায়ে গরিব মায়েরা যে

তাদের পরবর্তী গর্ভধারণকে বিলম্বিত করছিলেন, এই বাড়তি খাদ্য সংযোজন সেই সুফলকে খণ্ডন করে ফেলছে। তার মানে, ঈশ্বর যে অর্ধাহারী, অনাহারী, প্রান্তিক প্রসূতিদের ন্যূনতম জীবনধারণের জন্যে একটি বিশেষ সুবিধা বা ছাড়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন, সেই কথাটাও বিজ্ঞানগবেষণায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর তখন মহামান্য, মহাজ্ঞানী সেই বিজ্ঞানীদল তাঁদের সরকারের কাছে প্রস্তাব করে বসেন, অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণকারী, অপুষ্টির শিকার এইসব শিশুসন্তানের জননীদেরকে বাইরে থেকে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত যাতে করে তাদের প্রাকৃতিক পরিবার-পরিকল্পনা বিঘ্নিত না হয়। কেননা সেটা ঘটলে এইসব জনবহুল গরিব দেশগুলোতে ক্রমাগত আরও কতকগুলো অতিরিক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এবং বিশ্ব-অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর তা মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানীদের পরামর্শ শুনে ধনী রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ তখন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে শুরু করেন, আসলেই ভবিষ্যতে গরিব দেশের অপুষ্টির শিকার শিশুসন্তানের জননীদের সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা বা তাদেরকে বাড়তি খাবার খাওয়ার জন্যে পরামর্শ দেওয়া যুক্তিপূর্ণ হবে কিনা। বলা বাহুল্য, এই বিজ্ঞানী-দলে অথবা নীতি-নির্ধারণ কমিটিতে একজনও নারী সদস্য ছিলেন না।

মানুষের নিষ্ঠুরতার এই শীর্ষ পর্যায়ে স্বয়ং ঈশ্বরেরও টনক নড়ে স্বর্গে। তাঁর সিংহাসন দুলে ওঠে। নড়েচড়ে বসেন তিনি তাঁর প্রশস্ত গদির ওপর, সিংহাসনের ঠিক মাঝখানে। প্রকৃতই হতভম্ব হয়ে পড়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সহমর্মিতার এতখানি অনুপস্থিতি লক্ষ করে। এত বেশি অমানবিক হয়ে উঠেছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী! ঈশ্বর টের পান তার কাঙ্ক্ষিত পরিবার-পরিকল্পনা মানুষ গ্রহণ করবে না, আর তাই তাঁর বাঞ্ছিত পরিবার গঠনও তাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। অতঃপর ঈশ্বর এই অতি স্বার্থপর মনুষ্যজাতির দিক থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেন। এর ফলে মানবজাতি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, যাক। এই জাতি মহান কোনো জাতি নয়, শ্রেষ্ঠ তো নয়-ই। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই প্রচণ্ড বিরাগ ও অসন্তুষ্টি নারী জাতিকে এই মহাবিপদের দিনে খুব সাহায্য করে না।

এদিকে পৃথিবীর এক প্রান্তে এক দূরদর্শিনী, সাহসী নারী প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর থেকে বারে বারে ঘুরেফিরে কেবল একটিই স্বপ্ন দেখেন। তাঁর জীবনের অতি ব্যক্তিগত ও বেদনাদায়ক একটি অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে এবং বড় হবার পর থেকে সম্পূর্ণ একমুখী কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর মা পরপর এগারোটি সন্তান প্রসব করার ধকল সইতে না পেরে অকালমৃত্যু বরণ

করেছিলেন। যার ফলে এই নারী তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের আগমন থেকে নারীজাতিকে মুক্তি দেবার সংকল্পে। এই অসাধারণ নারী যে স্বপ্নটি পুনঃপুন দেখতেন, তা হলো, মাথাধরার বড়ির মতো করে একটিমাত্র ছোট পিল খেয়ে মেয়েরা নিজেরাই নিজের গৃহের নিভৃতিতে বসে তাদের গর্ভরোধ করতে সক্ষম হবেন। তাঁর এক ধনাঢ্য বন্ধু, আরেক যুগস্রষ্টা নারী, তাঁর স্বপ্নের কথা শুনে এই বিশেষ যাদুর বড়ি আবিষ্কারের প্রাথমিক অর্থ যোগান দিতে রাজি হন। দুজনে মিলে অনেক খোজাখুঁজি করে সেই যাদুর বড়ি বানাবার জন্যে সন্ধান পেলেন অতি মেধাবী এক বিজ্ঞানীর, যিনি অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-নির্ভর জাগতিক বিচারে তেমন সফল কেউ নন। কিন্তু অত্যন্ত কাজ-পাগল ও বিনেদিত-প্রাণ। এই বিজ্ঞানী তাঁর তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখতে পেলেন, যেন দিবাস্বপ্নের মতোই তাঁর কাছে ধরা দিল, এক অকাট্য সত্য; গর্ভবতী নারী পুনরায় গর্ভধারণ করে না যে কারণে– শরীরের হরমোনদের যে অবস্থা বা অবস্থান এই বিশেষ অবস্থার জন্যে দায়ী। যদি কোনোভাবে সেই অবস্থায় নারীকে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সেও আর গর্ভবতী হবে না। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নারী-দেহে হরমোনের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব।

বলা বাহুল্য, মানুষের ওপর প্রয়োগ করার আগে এই ধরনের কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি ও তার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার ব্যাপারটা ইঁদুরসহ অন্যান্য প্রাণীর ওপর ভালো করে আগে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়। তারপর সেই বিজ্ঞানী তাঁর চিন্তা ও যুক্তির খেই ধরে এবং প্রাণীদের ওপর গবেষণার ইতিবাচক ফলকে অনুসরণ করে অবশেষে প্রতিদিন মুখে খাবার জন্যে ছোট্ট এক হরমোন পিল আবিষ্কার করেন, যা মাথা ধরার বড়ির মতো করে খেয়ে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের নিভৃতিতে গর্ভরোধ করতে সক্ষম হয়। মানুষের ওপর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই গবেষণার কাজে তাকে সহযোগিতা করেন জন্ রক্ নামে এক ডাক্তার।

সেদিন থেকে নারী তার একান্ত নিভৃতিতে নিজেই নিজের গর্ভরোধ করতে সক্ষম হয় ঈশ্বর কিংবা পুরুষের করুণা বা সাহায্য ছাড়াই।

# ফিরে চায় ছায়া

বিক্রমপুরের এক গ্রাম। নাম দিঘলী। দিঘলী গ্রামে থাকে এক মেয়ে। বয়স বাইশ-তেইশ। হাই স্কুল শেষ করে স্থানীয় কলেজে এক-দুবছর অনিয়মিত ক্লাস করেছে। পরীক্ষাটরীক্ষা দেয়নি। এর বেশি আর কখনো কোথাও কোনোরকম পড়াশোনা করেনি। ঘরের কাজকাম মোটামুটি সবই করতে পারে। দেখতে তেমন আহামরি কিছু নয়। তবে তারুণ্যের সাধারণ একটি দীপ্তি রয়েছে– সারা গায়ে– মুখমণ্ডলে। বিশেষ করে ত্বকে-চুলে। বিয়ে হয়নি এখনও। তবে গ্রামের এক যুবককে সে পছন্দ করে। তরুণটিও ভালোবাসে তাকে।

সেই শিশুকাল থেকে মেয়েটির একটাই কেবল স্বপ্ন। একটাই আশা, লক্ষ্য, শখ, সাধনা, যা কিছুই বলা যাক-না কেন তাকে। সমস্ত আগ্রহ, দৃষ্টি, চিন্তা, বাসনা তার একমুখী। সে আমেরিকায় যেতে চায়। যেতে চায় কথাটা সঠিক হলো না বোধহয়। কিছু চাওয়ার চাইতে অনেক বেশি ব্যাপক এই বোধ। আমেরিকায় তাকে যেতেই হবে। সেটাই তার একমাত্র গন্তব্য-একমাত্র লক্ষ্য। আর মেয়েটি ভাবে, ভেবে স্থির করে, সেটা, মানে তার আমেরিকায় যাওয়া। যখন-তখন বা জীবনের কোনো একসময়, কোনো এক পর্যায়ে ঘটলেই চলবে না। তার এই বর্তমান জীবনের ঠিক পরের পদক্ষেপই হবে সেটা। তাদের মতো পরিবার থেকে কীভাবে, কার সাহায্য নিয়ে বা পেয়ে স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হবে, সে জানে না। কিন্তু শুধু জানে, আমেরিকায় তাকে যেতেই হবে।

বিয়ে করে সংসারী হবার জন্যে মা-বাবার প্রস্তাব বা চাপ তাই সে কানে নেয় না মোটেই। এমনকি তার প্রেমিকের নিবিড় সাহচর্যে থাকাকালীন তার দুই পেশিবহুল বাহুর মাঝে পিষ্ট হতে হতেও তার বিশেষ আকুতি তাকে টলাতে বা পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তার প্রিয় মানুষটির কাছে অন্যথায় সম্পূর্ণ নিবেদিত মেয়েটি। কিন্তু বিয়ের কথা, এই দিঘলী গ্রামে আটকা পড়ে যাওয়ার কথা শুনলেই প্রিয়তমের বাহুবন্ধন থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে সে। না, বিয়ে নয়, বিদেশে যেতে হবে তাকে। আর অন্য কোনো কিছু করার আগে, অন্য কিছু ভাবার আগেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে বিদেশের উদ্দেশ্যে। আর সেটা যেকোনো বিদেশে নয়। খোদ আমেরিকা। সেখানেই যেতে হবে তাকে। শুধু একটাই তো স্বপ্ন, সাধ বা ইচ্ছা! এটুকু পূরণ হবে না? আর তো কখনো কিছু চায়নি সে জীবনে! যা অনায়াসে এসেছে তার কাছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে বরাবর। এই প্রথম অধরা কিছু ধরতে চাইছে সে।

তার স্বপ্নে, সাধে একাগ্রতায় এবং সিদ্ধান্তে এতটা অবিচল দেখে একদিন ঈশ্বর বাধ্য হয়ে তার স্বপ্ন পূরণ করার অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু তার শখমতো এত বড় দাবি তিনি মেটাবেন আর বিনিময়ে মেয়েটি কিছুই ছাড় দেবে না, সেটা তো হয় না। কিছু স্বার্থত্যাগ তো তাকে করতেই হবে। তার মানে, বিদেশে যাবার আগে কিছু তাকে রেখে দিয়ে যেতে হবে পেছনে– তার স্বদেশে। কী রাখা যায়? কী রাখা যায়?

অবশেষে ঈশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার পরামর্শমতো মেয়েটি তার ছায়াকে দেশে রেখে যেতে রাজি হলো। কিন্তু কার কাছে রেখে যাবে সে তার ব্যক্তিগত এই সম্পদ যার কানাকড়ি বোধহয় মূল্য নেই– তার কাছে বা অন্য কারো কাছেই; যা একটা খোলা আয়নার মতো বস্তু, যা সার্বক্ষণিকভাবে তার সকল গতিবিধি নজরে রাখে।

নির্দিষ্ট দিনে, নিজের ছায়াটিকে প্রেমিকের কাছে রেখে মেয়েটি উড়োজাহাজে চড়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে চলে আসে। আসার সময় প্রেমিককে বলে, সে বিদেশে বৈধভাবে থাকার কাগজপত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোগাড় করেই তার ভালোবাসার পাত্রটিকে সেখানে নিয়ে যাবে। কাগজ পাঠালেই সে তার প্রিয়ার ছায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে বিশাল উড়োজাহাজে চেপে বসবে। উড়ে চলে যাবে তার প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে নিউইয়র্ক শহরে।

ঈশ্বর যখন তার বিদেশে যাবার অভিলাষ পূরণের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে, অর্থাৎ তার আজীবন লালিত স্বপ্ন, তার পরম প্রাপ্তির বিনিময়ে তাকেও কিছু স্বার্থত্যাগ করতে বলেছিল, মেয়েটি কখনো ভাবেনি, অন্য আর কিছু নয়, তার ছায়াটিকেই দেশে রেখে যেতে বলা হবে।

সে মনে মনে বহুরকম জিনিসের কথা ভাবার চেষ্টা করেছিল। কী দিতে পারে, তার। কী-ই বা আছে তার মতো সাধারণ একটি মেয়ের যার বদলে ঈশ্বর এত বড় একটা প্রত্যাশা, তার সারা জীবনের একমাত্র চাওয়া পূর্ণ করবেন? কী হতে পারে সেই জিনিস যার বদলে সে তার স্বপ্নের দেশে উড়ে যেতে সক্ষম হবে?

ঈশ্বর তখন একটু ভেবে বললেন, 'তোমার ছায়াখানা ছাড়তে হবে। আজ থেকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ আর তোমার ছায়া ঘুরে বেড়াবে না। তুমি আর ছায়া এখন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমার ছায়া রয়ে যাবে তোমার দেশে, তোমার প্রেমিকের কাছে গচ্ছিত। যতদিন তোমার প্রেমিক বিদেশে যেতে না পারছে, এই ছায়া তার কাছেই থাকবে।'

মেয়ে ভাবে, এটা কী আর এমন বেশি দেওয়া হলো! তার প্রাপ্তির সঙ্গে তুলনা করলে এত নগণ্য! সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মেয়েটি। মহা খুশিতেই। ছায়া তো

আর কোনো কাজে লাগে না। দৈনন্দিন জীবনে কী তার প্রয়োজন? এ তো আর তার চোখ, নাক, কান, হাত, পা বা মাথা নয়! ছায়া না থাকলে ক্ষতি কী? বরং উটকো একটা ঝামেলা দূর হবে। সারাক্ষণ এই বোবা জিনিসটা– ফিনফিনে পাতলা মানুষ আকারের কালো লম্বাটে বিদঘুটে এই বস্তুটা তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়– বিরক্তিকরভাবে তাকে পাহারা দিয়ে চলে। সেটা আর ঘটবে না। অবশেষে সে একা ও স্বাধীন হতে পারবে।

কিন্তু তখন সে বোঝেনি ছায়া শুধু সেটাই নয়, যাকে সে এতকাল ধরে দেখে আসছে, রোদে বা জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালে তার পিছু পিছু বা পাশে পাশে ঘাসের ওপর বা বাঁধানো রাস্তার ওপর বিছানো একখণ্ড কালো কাপড়ের মতো পড়ে থাকতে; যার আকৃতি ঠিক তার হেলেপড়া শরীরের গড়নের মতো। সে ভাবতো, ছায়া সেটাই, যা সে চলতে শুরু করলে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে: যখন আনমনে সে হেঁটে যায়, সেও চুপচাপ হাঁটে পাশে; যখন সে দৌড়ায়, তখন ছায়াটিও দৌড়ায়। যখন সে থেমে যায়, ছায়াও তার পথচলা থামায়। ছায়া তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করে চলে, তার মতো করেই হাত, পা, মাথা, আঙ্গুল নাড়ায়, কিন্তু তার সঙ্গে কখনো কথা বলে না। ছায়া একেবারে নিশ্চুপ।

সদ্য বিদেশে আগত মেয়েটি ছায়া হারিয়ে প্রথমে মনে করে সে কিছুই হারায়নি। এতবড় প্রাপ্তির বিনিময়ে যেটুকু বিধাতা নিল তার কাছ থেকে, সেটার তো কোনো প্রয়োজনই নেই জীবনে। আসলে ওটা ছিল তার শরীরের বাইরে অথচ শরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা বাড়তি সংযোজন। সবচেয়ে বড় কথা, ছায়াটি ছিল তার নিভৃতির অন্তরায়। কোথাও কাউকে না বলে চুপিচুপি পা টিপে বেরিয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না তার। তাকে দেখা না গেলেও তার ছায়া কারো না কারো চোখে পড়তোই পড়তো। এখন সে একা। সম্পূর্ণ একা। পুরোপুরি মুক্ত। ছায়া দ্বারা আর পরিবৃত নয়। সারাক্ষণ তাকে তার আরেক সত্তা, ছায়া, সর্বক্ষণ অনুসরণ করে বেড়ায় না আর।

কিন্তু কিছুদিন গেলেই মেয়েটি টের পায়, ছায়া শুধু ছায়া নয়, অর্থাৎ রোদে বা জ্যোৎস্নায় তার পিছু পিছু চলা তার অবয়বের একটা অস্পষ্ট কালো প্রতিফলন নয়। ছায়া তার চেয়েও বেশি কিছু।

সে বোঝে, ছায়ার সঙ্গে সে আরও অনেক কিছুই হারিয়েছে। আয়নার সামনে বা শান্ত সরোবরের ধারে দাঁড়ালে নিজের প্রতিবিম্ব আজ আর দেখতে পায় না মেয়েটি। সেখানে আজ ধূ ধূ শূন্যতা। মাথা কুটলেও সে বুঝতে বা জানতে পারে না, সে দেখতে কেমন এখন। আজকে এই মুহূর্তেই বা তাকে কেমন দেখাচ্ছে। একটু আগে বিয়েবাড়িতে যাবার আগে তার ঠোঁটের ওপরে হালকাভাবে যে রক্তাভ লিপস্টিক সে বুলিয়েছিল, সে জানে না সেই লালচে রঙটি পাতলা ঠোঁট দুটো

অতিক্রম করে তার নাক আর ঠোঁটের মাঝখানের সরু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে কিনা বা সেখানে থ্যাবড়ে গিয়েছে কিনা। হাতে আয়না। অথচ নিজেকে তার ভেতর দেখতে পায় না সে। লিপস্টিকটা যথার্থভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা, এ সামান্য জিনিসটুকুও আজ আর নিজের পক্ষে জানার উপায় নেই তার। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মোট কথা, সে নিজেকে, কেমন সে দেখতে, অন্যের কাছে তাকে কী রকম দেখাচ্ছে, শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে নীল রঙের টিপটা যে আজ দুপুরে পরতে চেয়েছিল কপালের ঠিক কেন্দ্রস্থলে, সেটা সঠিকভাবে স্বস্থানে বসানো হয়েছে কিনা, নাকি একটু ডানে বা বামে চলে গেছে, এসব কোনো কিছু না জেনে, না বুঝতে পেরে, সবসময় অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে গিয়ে তার কেমন বিরক্তি এসে যায়। এ কি কারো ভালো লাগে? এভাবে বেঁচে থাকা যায়? না সে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয়?

দিন গেলে মেয়েটি টের পায় ছায়াহীন সে আরও গভীরতর, আরও বড় কিছু হারাতে বসেছে। সে বিদেশে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তার বৈধ কাগজপত্রের সন্ধান মেলা ভার। আজকাল সবকিছুই বেশ কঠিন হয়ে গেছে। অনেক বেশি কড়াকড়ি। আগের মতো সহজ নেই আর। ঈশ্বরের দয়া বা কারসাজিতে তেমন পয়সাকড়ি ছাড়াই পাশের গ্রামের ডিভি ভিসা পাওয়া যে যুবকের কাগজেকলমে পত্নী সেজে সে বিদেশে আসার সুযোগ পেয়েছিল, সে এদেশে এসে এত তাড়াতাড়ি তাকে পরিত্রাণ দেয়নি। আমেরিকায় আসার ছাড়পত্র সরবরাহ করে যে মস্ত বড় উপকার করে ফেলেছে সে, তার কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নিতে সে মেয়েটিকে নিজ শয্যায় যখন তখন টেনে নিতে দ্বিধা করেনি একটুও। মেয়েটির আপত্তি বা অভিযোগে কর্ণপাত করেনি লোকটি। তাকে প্রবলভাবে বাধা দেবার অধিকার বা ক্ষমতাও ছিল না মেয়েটির। কেননা সে আইনসঙ্গতভাবেই এই যুবকের স্ত্রী, যদিও তাকে মোটেই পছন্দ করে না সে।

ওদিকে দিঘলী গ্রামে বসে, তার ছায়া গায়ে দিয়ে প্রতীক্ষারত তার প্রকৃত প্রেমিক এত দূরে বসেও মেয়েটির প্রতি এই শারীরিক নির্যাতন, এ অনাচার, মেয়েটির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বারবার এই লোকটির তরফ থেকে মেয়েটির শরীর খাবলে নেবার কদর্য অকর্মটি পুরোপুরি এবং স্পষ্ট টের পায়। তার গায়ে বিছানো মেয়েটির ছায়া বারবার কেঁপে ওঠে এই নির্জন দিঘলী গ্রামের অন্তঃপুরে, প্রতিবার যখন সেই লোকটি মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্পর্শ করে। কিন্তু এর প্রতিবাদে এত দূরে বসে কিছুই করতে পারছে না মেয়েটির প্রেমিক। না পেরে কেবল নিজে নিজেই সারাক্ষণ ছটফট করছে। একা একাই রাগে ফুঁসছে। এখানে বসে বসে কী করবে সে? ছায়াটিকে তার কাছে ফেলে রেখে গিয়ে তার প্রেমিকা বড়ই কষ্ট ও যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দগ্ধ করছে সারাক্ষণ। অক্ষম

ক্রোধে শুধু অঙ্গারের মতো একা একা জ্বলতে থাকে সে নিজের ঘরের নিভৃতিতে। মেয়েটির কাছ থেকে বহু দূরে। বিক্রমপুরের দিঘলী গ্রামে।

এত কিছুর পরেও একটু বিরক্ত হয় না মেয়েটির প্রেমিক। বরং সহানুভূতিতে বুকটা ভরে যায় তার। আহা বেচারা! এরপর দিন গিয়ে মাস আসে, মাসের পর বছর। কেটে যায় বছরের পর বছর। বৈধ ভিসা জোগাড় বা প্রেমিকের এখানে আসা, কোনোটাই এগোয় না। এরকম একসময়ে দিঘলী গ্রামে বসে খবর পায় তার প্রেমিক, অনেক কষ্টেসৃষ্টে একটি কাজ জোগাড় করেছে মেয়েটি। রোজগার করতে শিখেছে। আর কারো মুখাপেক্ষী সে নয় জীবন ধারণের জন্য।

আরও দিন গেলে মেয়েটি টের পায়, আস্তে আস্তে তার আশপাশের বা দূরদূরান্তে থাকা স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত অনেকেই বয়সের ভারে, অসুস্থ হয়ে, একে একে মারা যেতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে প্রায় সকল আপনজনকেই সে হারাতে বসে। কিন্তু তবু এখনও নিজে বেঁচে আছে, বেঁচে আছে এক অপরিচিত পরিবেশে যেখানে দীর্ঘদিনের চেনা আর প্রায় কেউই অবশিষ্ট নেই।

তখন মেয়েটি ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, এভাবে বটগাছের মতো সময় আগলে এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। আত্মিক বাঁধন যাদের সঙ্গে রয়েছে, তারাই যদি পাশে না থাকে এই বেঁচে থাকা তো অর্থময়, সুখকর হতে পারে না! চারদিকে তাকিয়ে মেয়েটি দেখে, তার দেশ থেকে প্রায় একই সময়ে এদেশে আসা লোকেরা এখন প্রায় কেউই নেই শহরে। হয় মারা গেছে, নয় দেশে বা অন্যত্র চলে গেছে। এখানে এখন সকলেই নতুন, প্রায় সবাই তরুণ, সকলেই অপরিচিত। আশপাশে কেউ নেই যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে সে– যাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছিল আগে, যারা নানানভাবে তার জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ– মূল্যবান। স্বদেশে ফেলে আসা তার সেই প্রেমিক যে বছরের পর বছর ধরে তার ছায়া বয়ে বেড়াচ্ছে, তার জন্যে এখনও অপেক্ষা করছে, তাকে এখন ভীষণভাবে পাশে চায় মেয়েটি। সে জানে, সে মানুষটি তার ছায়া আগলে আজো নিশ্চুপ পড়ে আছে দিঘলীতে। তারই অপেক্ষায়।

এদেশে বৈধভাবে থেকে যাবার কাগজপত্র হবার সম্ভাবনা আর নেই তার। কয়েকবার বাতিল হয়ে যাবার কারণে ওটা এখন নিশ্চয় অন্ধকার সিন্দুকের ভেতর কোথাও জায়গা করে নিয়েছে স্থায়ীভাবে। এ ব্যাপারে মেয়েটার সবচেয়ে ক্ষতি করেছে সেই লোক, যার বউ সেজে সে এসেছিল এখানে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে ব্যবহার করতে দেয়নি মেয়েটি। একসময় ফুঁসে উঠেছিল সে। উঠতে পেরেছিল কেননা তখন সে রোজগার করতে শুরু করেছে। পরিণামে তাকে পরিত্যাগ করে আক্ষরিক অর্থেই পথে ফেলে দিয়ে চলে যায় লোকটি। তাকে ভিসা পেতে সাহায্য

করা দূরে থাকুক, সে যাতে বৈধ ভিসা কখনো না পায় সেই চেষ্টাই করে গেছে সে — আজো করছে। এই বয়সেও— এত বছর পরেও। দূরে অন্য শহরে বসেও। আর তখন থেকেই বেঁচে থাকার জন্যে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যে ক্রমান্বয়ে লড়ে যাচ্ছে মেয়েটি। সম্পূর্ণ একা।

মেয়েটি ভাবে, এটা কেমনতর বেঁচে থাকা তাহলে? নিজের হাতে-পায়ের কুঁচকানো চামড়ার দিকে তাকিয়ে সে বোঝে, বয়সের ভারে সে ক্লান্ত। তার মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু সে জানে না, কোনোমতেই বলতে পারবে না, এখন সে দেখতে কেমন। নিজেকে সে চিনতে পারবে কিনা। মেয়েটি জানে না, আসলেই সে কে, যে বেঁচে আছে, যার দেহ ধারণ করে আছে, বহন করে যাচ্ছে তার এই বাহ্যিক সত্তা!

মেয়েটি তখন ঈশ্বরকে বলে, 'আমার বিদেশে থাকার শখ মিটেছে। তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও আমার দিঘলী গ্রামে। সেখানে গেলে আমার ছায়াটি আমাকে ফিরিয়ে দাও যাতে আমি তার সাথে একত্রিত হয়ে আবার একটি পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারি। শেষবারের মতো নিজেকে প্রাণভরে একবার দেখতে পারি। জানতে পারি আমি কে। পরিচিত হতে পারি নিজের মুখমণ্ডলের সঙ্গে। তা ছাড়া, আমি চাই আমার প্রেমিককে ভারমুক্ত করতে। আর কতকাল সে আমার ছায়া বয়ে বেড়াবে?'

ঈশ্বর মেয়েটির ইচ্ছা পূর্ণ করেন। মেয়েটি আবার দিঘলী গ্রামে ফিরে আসে। ফিরে আসে তার ছায়ার কাছে। তার প্রেমিকের কাছে। বহু বছর পরে সে আবার নিজেকে নিজে দেখতে পায়।

আয়নায়।

সরোবরে।

তার ভালোবাসার জনের বয়সের ভারে ঘোলা চোখের মণিতে।

*(একটি বিদেশি রূপকথার ছায়া অবলম্বনে)*

# বারে বারে ফিরে ফিরে

I will plant my hands in the garden
I will grow I know I know I know
– Forugh Forrokhzad

তার প্রেমের চাইতে বড় ছিল মেয়েটি।

লোকটি তা আগে বুঝতে পারেনি।

ভেবেছিল অন্তহীন প্রেমের জোয়ারে এমন করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মেয়েটিকে, যে অন্য কিছু চাইবার থাকবে না আর তার।

অথবা অন্য কোনো কিছু ভাবার অবসর-ই পাবে না।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল অনেক কিছুই চাইবার রয়েছে মেয়েটির।

পুরুষ মানুষের ভালোবাসা সেই অনেক কিছুর একটি উপকরণ মাত্র।

ফলে লোকটার সুঠাম শরীর আর রাতভর অকৃত্রিম সোহাগ-আদর বিতরণ তাকে অনাবিল আনন্দ দিলেও তা যথেষ্ট মনে হয়নি মেয়েটির।

মেয়েটি চুপচাপ আকাশ দেখতে চাইত।

থেকে থেকে দখিনা হাওয়ায় উন্মনা হয়ে শূন্য পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কখনো কখনো সারা রাত ধরে কোনো একটি বিশেষ কবিতা বা গান তার মনে একটানা গুনগুন করে যেত।

সে বৃষ্টি, জল, গাছ ও পশুপাখি ভালোবাসত।

বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটাতে চাইত নিজের বাগানে।

দুপায়ে ঘুঙ্গুর বাজিয়ে চৈত্রের শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে যাবার শখ হতো তার।

খোলা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে দীর্ঘ পুরাণ বা পাঁচালি পাঠ করত সে।

সেই সঙ্গে আবার প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনায় অথবা মানবকুলের জন্যে মঙ্গলকর কিছু ঘটার আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকত মন।

প্রাত্যহিক ও সাংসারিক কাজের বাইরে আরও কিছু কর্মকাণ্ড, কোনো বৃহত্তর বা মহত্তর পদক্ষেপ নেবার চিন্তা করত মেয়েটি।

আকাশের মতো উদার, বটবৃক্ষের মতো দীর্ঘ আর ঋজু, দিঘির জলের মতো প্রশান্ত, আবার সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে পেখম তোলা ময়ূরের মতো উচ্ছল নৃত্যরতা হতে চাইত সে।

লোকটি মেয়েটির এসব পাগলামি একেবারে বুঝতে পারত না। কেমন অর্থহীন মনে হতো সবকিছু তার কাছে।

এই ধরনের ছেলেমানুষি আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখ প্রকৃতই অসহ্য লাগত তার।

কিন্তু পুনঃপুন নিষেধ করা সত্ত্বেও মেয়েটি তার কথা অমান্য করে নিজস্ব আনন্দ আর পছন্দ-মতোই চলতে থাকে।

একদিন সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায় লোকটির।

গভীর রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হঠাৎ সে মেয়েটিকে খুন করে বসে।

তারপর তার দেহটি ধারালো বটি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে সেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা মেয়েটির শরীরের প্রতিটি অংশ থেকে অতঃপর জন্ম নেয় এক একটি পূর্ণাঙ্গ নারী।

চেহারায়, স্বভাবে, মেজাজে, কর্মে, বুদ্ধিমত্তায় পরম বৈচিত্র্যময় সেই সব নারী, যারা প্রত্যেকেই অসময়ে খুন হয়ে যাওয়া এই মেয়েটির ভগ্নাংশ মাত্র।

## দুর্গা

মেয়েটির ধড়টি যেখানে পড়ল, সেখানে জন্ম নিল এক অভিনব নারী যার রয়েছে দশটি হাত। একই সঙ্গে দশ হাত দিয়ে দশ রকম কাজ করে যেতে পারে সে। তার দুই হাত যখন সন্তানকে আদর বিলাতে ব্যস্ত, তখন তার অন্য দুই হাত দুর্জন বা অসুরকে অনায়াসে বধ করতে সক্ষম। বহু গুণে গুণান্বিত দুর্গা। সে একাধারে নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকা ও স্ত্রী এবং পরম স্নেহময়ী মাতা। অন্ন ও বস্ত্রদায়িনী বলে সকলের কাছে পরিচিত সে। তার ধৈর্য, সহনশীলতা, মায়া-মমতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনো তুলনা হয় না। আবার অন্য দিকে সন্ত্রাসী বা খুনিদের আবির্ভাব ঘটলে তাদের হাত থেকে পরিবার ও প্রতিবেশীদের রক্ষা করতে সে হয়ে উঠতে পারে অত্যন্ত কঠোর এবং ভয়ঙ্কর। অতিশয় বুদ্ধিমতী দুর্গা একজন দক্ষ ও কৌশলী যোদ্ধাও বটে। দুর্জনের প্রতি সে ভয়ানক কঠিন। শত্রু বা অনিষ্টকারীর আশঙ্কায় তার হাতে সর্বদাই ধরা থাকে ধারালো অস্ত্র, যেমন ধরা থাকে অন্য হাতে

শৌখিন পদ্মফুল আর শঙ্খ। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও সকল নারীর ঈর্ষা-জাগানো অসীম রূপবান ও ক্ষমতাধর এবং গুণে গুণান্বিত স্বামীকে নিয়ে সংসার দুর্গার। তবে স্বামী তার যত নামি দামি আর শক্তিশালীই হোক না কেন, তার আত্মভোলা স্বভাব আর নেশার প্রতি দুর্বার আসক্তি দুর্গার কম মনোকষ্টের কারণ নয়। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত দুঃখ আর হতাশা মনের গভীরে ধারণ করেও মানুষের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি, বিচ্যুতি যেমন– হিংসা, বিদ্বেষ, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা, উষ্মা, অহংকার থেকে মুক্ত করে তাদের অন্তর নির্মল করে দিতে সর্বদাই তৎপর এই মাতৃরূপী মহীয়সী নারী।

## সীতা ও আয়েশা

মেয়েটি দুটি খণ্ডিত হাতকে একসঙ্গে ছুঁড়ে মারলেও সেগুলো গিয়ে পড়ল যোজন যোজন দূরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই জায়গায়– পৃথিবীর দুই প্রান্তে।

বাম হাত থেকে জন্ম নিল সীতা।

আর ডান হাত থেকে আয়েশা।

দুজনেরই বিয়ে হয় দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারে, স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রধান নেতার সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দুজনেরই স্বামীর কাছে সতীত্ব ও নির্দোষ প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঘটনা পরম্পরায়, যে ঘটনা বা দুর্ঘটনার ওপর তাদের কোনো হাত ছিল না।

সীতা বাম হাতের মতোই কেমন নির্জীব, নিস্তেজ, দুর্বল। অত্যন্ত শান্ত, নম্র, বিনয়ী স্বভাবের সীতা নিজের মতোই অন্য সকলের মধ্যেও শুভ আর সততার সমাবেশ আশা করে। আর তাই সমাজকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তার সমাজপতি স্বামী যখন সর্ব-সম্মুখে তাকে তার সতীত্ব প্রমাণ করতে আদেশ করে, রাগে দুঃখে অপমানে জর্জরিত সীতা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠার পরিবর্তে নীরবে আত্মহননের পথই বেছে নেয়।

কিন্তু দৃঢ়চেতনা আয়েশা এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। তার নিষ্পাপ চরিত্রে কালিমা লেপন করে দেওয়া হবে, আর সে ভয়ে, লজ্জায় মুখ ঢাকবে বা আত্মঘাতী হবে, তা হয় না।

বুদ্ধিমতী যুক্তিবাদী আয়েশা, সার্থকভাবে সরাসরি যুদ্ধ করার যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, ব্যক্তিগত এই সংকট ও সংগ্রামকেও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়। এমন অসম্মানজনক পরাজয়কে এত সহজে মেনে নিতে পারে না আয়েশা।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, যারা তাকে এই মিথ্যা অপবাদ দেবার চেষ্টা করেছিল, তাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থাও করতে সমর্থ হয় আয়েশা।

## রাধা

মেয়েটির উপড়ে ফেলা হৃৎপিণ্ড থেকে জন্ম নিল রাধা।

আয়ান ঘোষের গৌরবর্ণা সুন্দরী তরুণী স্ত্রী রাধার মন উদাস, অস্থির। ঘরকন্নায় তেমন নজর নেই।

কৃষ্ণ প্রেমে সার্বক্ষণিকভাবে হিমশিম খায় রাধা।

রাখাল ছেলে কৃষ্ণের বাঁশি শুনলে সব ভুলে গিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে যায় সে।

কলসি কাঁকে ঘাটে জল তুলতে যাবার নাম করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয় রাধা।

বনফুল, ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টির জল, যমুনা নদী, আম্রকানন যা এক সময় তার বুকে অনবরত ঢেউ তুলত, তা আজ কৃষ্ণের কথাই মনে করিয়ে দেয় কেবল। স্বামীর উষ্মা ও বিরাগ, লোকনিন্দা, সখীদের তিরস্কার কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না রাধার। কৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত সে। কৃষ্ণের প্রেমে পুরোপুরি নিবেদিত।

কিন্তু স্বামীকে ভুলে যার জন্যে পাগল-প্রায় রাধা সর্বক্ষণ ঘর-বাহির করে, অসতীর বদনাম কুড়ায়, সেই কৃষ্ণ কিন্তু রাধার প্রতি মোটেও বিশ্বস্ত নয়।

রাধার প্রিয় সখীদের সঙ্গেও রাধার চোখের আড়ালে প্রতিনিয়ত ফষ্টিনষ্টি করে কৃষ্ণ। রাধা সব বুঝেও যেন কিছুই বোঝে না, সব দেখেও যেন কিছুই দেখে না।

কৃষ্ণ ভালো করেই জানে, তার অবিশ্বস্ততাসহ যাবতীয় কুকর্মের জন্যে ক্রুদ্ধ রাধার মানভঞ্জন করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না তার।

কৃষ্ণ জানে, অন্ধ প্রেমে, এক দুর্বার আকর্ষণে, নিজের আবেগের কাছে সম্পূর্ণ বন্দী কোমলমতি রাধা কান পেতে বসে থাকবেই কৃষ্ণের ডাকের অপেক্ষায়।

রাধা সত্যি সত্যিই বসে থাকে পরম প্রতীক্ষায়।

নিরবধি বসে থাকে তার কালার সেই পরিচিত বাঁশের বাঁশির আওয়াজ শোনার আশায়।

## রুথ

মেয়েটির যকৃত থেকে জন্ম নেয় রুথ।

নাওমির পুত্রবধূ রুথ।

অর্থাৎ নাওমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মালনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রুথের।

জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত অথচ অন্তরে নির্মল, স্বভাবে দয়ালু মধ্যবয়সী নাওমির আদি বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে।

বেশ কিছু বছর আগে খরা ও দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে স্বামী ও দুই নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের দেশ ছেড়ে এই ভিনদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল নাওমি। কালে সেই ভিনদেশের দুই কন্যা রুথ এবং অর্পার সঙ্গে নাওমির দুই ছেলের বিয়ে হয়। ততদিনে নাওমির স্বামী মারা গেছে। কিছুদিন যেতে না যেতে নাওমির দুই পুত্রও অকালে মারা যায়। শোকাতুর নাওমি নিকটতম পরিবারের সকলকে হারিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আবার স্বদেশে ফিরে যাবে। ততদিনে তার দেশে দুর্ভিক্ষও শেষ হয়ে গেছে।

দুই বিধবা পুত্রবধূকে ডেকে নাওমি বলে, 'আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছি। আজ থেকে তোমরা মুক্ত-স্বাধীন। তোমাদের স্বামীরা জীবিত নেই। ফলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর থাকার প্রয়োজন নেই। তোমরা নতুন করে তোমাদের জীবন আবার শুরু কর এখানে।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছোট পুত্রবধূ অর্পা তার জিনিসপত্র নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পরিত্যাগ করে চলে যায়।

কিন্তু রুথ প্রবলভাবে বেঁকে বসে।

শাশুড়ির কাছে আর্জি তার, 'দোহাই তোমার, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে বলো না আমায়। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব। তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানেই থাকব। তোমার লোকজন-ই আমার নিজের লোকজন। তোমার ঈশ্বর-ই আমার ঈশ্বর। তুমি যেখানে দেহত্যাগ করবে, আমিও সেখানেই মরব এবং সেখানেই সমাহিত হব।'

অতঃপর নাওমি রুথকে সঙ্গে নিয়েই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। দ্বিধাহীন রুথ অনায়াসে তার জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত পরিবেশ সব ছেড়ে শাশুড়ির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন এক দেশে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে জীবনধারণের জন্যে ফসলের মাঠে কাজ করতে গিয়ে রুথের সঙ্গে আলাপ হয় নাওমির স্বামীর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের, যার নাম বোয়াজ। পরবর্তীকালে নাওমিসহ পরিবারের সকলের সম্মতিতে বোয়াজের সঙ্গে বিয়ে হয় রুথের। বিয়ের কিছুদিন

পর রুথের কোলে আসে ওবেদ নামে এক পুত্রসন্তান। এভাবে নাওমির স্বামীর বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে রুথ। শুধু তাই নয়, রুথের পুত্র ওবেদ আর কেউ নয়, সর্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ডেভিডের পিতামহ।

## আম্রপালি

মেয়েটির নাভি থেকে জন্ম নেয় পরমাসুন্দরী যে নারী তার নাম আম্রপালি। শোনা যায় জন্মের পর এক আমবাগানে প্রথম তাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। সেই জন্যেই তার নাম রাখা হয় আম্রপালি। কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে রাজা ও রানি তাদের কন্যা হিসেবে সাদরে গ্রহণ করে। দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদের ভেতর রাজকন্যা হিসেবে মেয়েটি বড় হয়ে ওঠে। তার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়- দৃষ্টি অনড় হয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এমন রূপবতী কন্যা আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। যে তাকে দেখে সেই তার প্রেমে পড়ে যায় এবং প্রত্যেকেই আম্রপালিকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আম্রপালিকে নিয়ে রাজ্যের পুরুষমানুষের মধ্যে রীতিমতো মল্লযুদ্ধ বেঁধে যায়। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক এ রাজ্যে এমন বিশৃঙ্খলা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। সংসদে এই বিষয় নিয়ে গুরুতর আলোচনা শুরু হয়। অতঃপর দেশের ও জনগণের শান্তি ও সৌহার্দের স্বার্থে স্থির করা হয়, আম্রপালিকে রাষ্ট্রীয় বারবনিতা বানানো হবে, যাতে করে প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জন করতে পারে সে। এর ফলে বাকি সকলকে বিফল মনোরথ করে বিশেষ একজনকে বিয়ে করতে পারবে না আম্রপালি। আম্রপালির মতো সুন্দরী সচরাচর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। ফলে তার মতো অসীম রূপবতীকে অবশ্যই বহুজনের ইচ্ছা ও অভিলাষ পূরণ করতে হবে। সে স্থায়ীভাবে কোনো একজনের গৃহকোণে বাঁধা পড়ে থাকার মতো সাধারণ কেউ নয়। তাছাড়া সেরকম কিছু যদি ঘটে, তাহলে দেশময় প্রচণ্ড অসন্তোষ ও হানাহানি শুরু হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে আম্রপালি-ই বোধহয় একমাত্র নারী যাকে রাষ্ট্রীয় আদেশে এবং সরকারি সিদ্ধান্তে বারবনিতা হতে হয়। ফলে আম্রপালি কী চায়, তার কী ইচ্ছা এসব বিবেচনায় না এনে তাকে রাতারাতি রাষ্ট্রীয় বারবনিতা বানিয়ে ফেলা হয়। যার খুশি সেই তাকে ভোগ করতে পারে। এমনকি এই রাজ্যের পরম শত্রু পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজাও আম্রপালির রূপে আকৃষ্ট হয়ে একদিন ছদ্মবেশে এসে ঢোকে আম্রপালির কুটিরে। শোনা যায়, তাদের মধ্যে দেহজ সম্পর্ক ছাড়াও আস্তে আস্তে একধরনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। একসময় দুজনের নিবিড় প্রেমে জন্ম নেয় এক শিশু। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ভিনদেশি রাজাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে হয়। আর আম্রপালি নিজের এই নষ্ট ও জিম্মি জীবনের প্রতি

বীতশ্রদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্দিরে কোনো নারী ভিক্ষু ছিল না। সকল ভিক্ষুই ছিল পুরুষ। আম্রপালিই প্রথম নারী-ভিক্ষু হিসেবে সেখানে যোগ দেয় এবং বাকি জীবন বৌদ্ধ মন্দিরেই কাটিয়ে দেয়।

## এথেনা

মেয়েটির জরায়ু থেকে জন্ম নেয় যে নারী, চেহারা ও সাজসজ্জায় যাকে নারী না পুরুষ সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় না, সেই অসাধারণ মেধাবী এথেনা কিন্তু বৈচিত্র্যময় গুণে গুণান্বিত। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, যৌক্তিক, সৃষ্টিশীল এবং রণকৌশলে পারদর্শী। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম। এথেনা সেই নারী যে তার অর্জিত বহুমাত্রিক জ্ঞান ও সাধারণ জীবন থেকে নেওয়া ব্যবহারিক প্রজ্ঞা থেকে চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে। লাঙলের গড়ন পরিবর্তন ও তার সঠিক ব্যবহার, গরু ও ঘোড়াকে চাষের কাজে লাগানো, যাবতীয় গৃহস্থালি পশুর প্রজনন-পদ্ধতির উন্নয়ন, নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে অতিরিক্ত ফলনের ব্যবস্থা– এ সবই এথেনার দান। কৃষিকাজ ছাড়াও বিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য নানান ছোটখাটো আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারণকে সহজতর করে দিয়েছে এথেনা। সভ্যতাকে নিয়ে গেছে অনেকখানি এগিয়ে। মোটকথা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে এক উন্নততর স্তরে পৌঁছে দিতে এথেনার অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, নেভিগেশনের কলাকৌশলের সূক্ষ্ম পরিবর্তন করে তাকে নির্ভুল করে তোলা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন কলাকৌশল আবিষ্কার ও তার প্রয়োগও এথেনার কল্যাণে মানুষ জানতে পারে। নারীদের জন্যে বিশেষ উপযোগী ও উপার্জনক্ষম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এথেনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এছাড়া কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়ী হবার পদ্ধতিও শিখিয়ে গেছে এথেনা তার সতীর্থদের। এত যে গুণী এথেনা, সে কিন্তু সারা জীবনে কোনো পুরুষের ঘর করেনি, পুরুষের শারীরিক সঙ্গ উপভোগ করেনি। তাকে ধর্ষণ করতে এসে বার বার ব্যর্থ হয়েছে একাধিক পুরুষ। এথেনা চিরকাল তার কৌমার্য বজায় রেখেছে। ব্যক্তিগতভাবে পুরুষের ভালোবাসা ভোগ করার চাইতে সকলের জন্যে কল্যাণকর কিছু করার দিকে বেশি মনোযোগী ছিল এথেনা।

## তুবা

মেয়েটির ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো যেখানে গিয়ে পড়ল সেখানে জন্ম নিল যে নারী তার ছিল এক তীব্র ভীতি রোমান্টিক প্রেম ও মানবিক যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে। অথচ সে সন্তানের ব্যাপারে ছিল অতি দুর্বল। মা হবার জন্যে ভয়ানক

কাতর। সন্তান-অভিলাষী এই নারী তার এই প্রচণ্ড ও অদম্য ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে নদীর ধারে গিয়ে একমনে ধ্যান শুরু করে। স্থির করে তার আরাধ্যকে অর্জন না করা পর্যন্ত সে এভাবেই বসে থাকবে। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ কোনো কিছুকেই পরোয়া করে না সে। হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করে, একটি বৃহৎ বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে। গাছটির নাম তুবা। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এ গাছ এত বড় যে তার সামনে দাঁড়ালে আশপাশের আর কিছু দেখা যায় না। তুবা গাছের ছায়ায় যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকরা অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ঘোড়া চালিয়ে চলে যেতে পারে। বিশ্রাম নিতে পারে। দূরপাল্লার পথিকরা তুবা গাছের নিচে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে রাত্রি কাটায়। এই গাছের পাতায় সাদা, হলুদ, সবুজ আর লাল রঙের সমাবেশ। তুবা গাছের শিকড় থেকে অনবরত ফোয়ারার মতো উথলে পড়ে খাঁটি মধু, দুধ ও দ্রাক্ষারস। দেখতে দেখতে গাছটি আরও বড় হয়। একসময় এ গাছের ফুল ফোটে। সহস্র সহস্র নয়নাভিরাম উজ্জ্বল রঙের ফুলে ভরে যায় তুবা গাছ। তুবা গাছের পাতা ও ফুল থেকে এক অপূর্ব সুবাস বেরিয়ে আসে যা সত্যি অতুলনীয়। তুবার সুগন্ধ আশপাশের লোকজনকে উন্মনা করে, মোহিত করে, নির্মল আনন্দ দেয়। তুবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে খুব মিহি ও মসৃণ একরকম কাপড় তৈরি হয়, যা দিয়ে শৌখিন ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষ এক ধরনের পোশাক বানানো যায়। একসময় ফুল থেকে জন্ম নেয় অত্যন্ত সুস্বাদু এক ফল। এই ফলের স্বাদ এমনি অসাধারণ যে একবার যে তুবা ফল খেয়েছে, সে কোনোদিন এর কথা ভুলবে না। নদীর ধারের এই বিশাল তুবা গাছ থেকে অনবরত জলে টুপটাপ করে পড়ে তুবার ফল ও ফলের বিচি। নদীর স্রোত সেই ফল ও বিচি বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে। এমনি করে বহু সন্তানের জননী এই নারী, এই তুবা গাছ, তার সাধের সন্তানদের সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়।

## শাহারজাদী

মেয়েটির চোখ দুটো গিয়ে পড়ল যেখানে, সেখানে জন্ম নিল শাহারজাদী বলে আয়তনয়না এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী; যার জ্ঞান, বুদ্ধি, কলাকৌশল, দূরদৃষ্টি ও সৃষ্টিশীলতার কথা রাজ্যময় পরিচিত। প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ শাহরিয়ার-এর প্রধান উজিরের কন্যা শাহারজাদী। ইদানীং বাদশাহ শাহরিয়ারের মনমেজাজ খুবই খারাপ। তার পত্নীর অবিশ্বস্ততার কারণে রাগান্বিত শাহরিয়ার সম্পূর্ণ নারী জাতির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েই তাই ক্ষান্ত হয়নি বাদশাহ, পুরো নারী জাতির ওপর-ই জমে উঠেছে তার তীব্র ঘৃণা। শাহরিয়ার তার প্রতি তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নেয়। তার ধারণা পৃথিবীর সকল মেয়েই নষ্ট প্রকৃতির। ফলে তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার

নেই। মৃত্যুই তাদের প্রাপ্য। ফলে তার আদেশমতো তার প্রধান উজির প্রতিদিন রাজ্য থেকে একটি করে কুমারী কন্যা জোগাড় করে আনে। বাদশাহ সেই রাতেই মেয়েটিকে বিয়ে করে এবং পরদিন খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই তার আদেশে নববধূকে হত্যা করা হয়। দেখতে দেখতে রাজ্যময় প্রায় সকল কুমারীকেই এভাবে হত্যা করে ফেলে শাহরিয়ার। এদিকে উজির বেচারা ভয়ে কাঁপে। কেননা নিত্য নতুন কুমারী এনে দিতে না পারলে তার নিজের গর্দানই যাবে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ রাজ্য খুঁজে বিবাহযোগ্যা কুমারী মেয়ে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এই দারুণ অসময়ে পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসে শাহারজাদী। সে বাবাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে সেই রাতে নিজেই হয় সেই কুমারী যাকে বাদশাহ বিয়ে করে। কিন্তু তার সহজাত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কলাকৌশল ও সৃজনশীলতার গুণে বিয়ের রাতে সে বাদশাহকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করায় তার মুখ থেকে খুব মজার এক গল্প শোনার জন্যে। এতই মনোগ্রাহী সেই কাহিনি ও বলার ধরন যে শাহরিয়ার মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতে থাকে। গল্প শুনতে শুনতে ভোর হয়ে যায়। কিন্তু এই আশ্চর্য গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটিকে তো খুন করা যায় না। ফলে শাহারজাদীর আয়ু আরও একটা দিন বেড়ে যায়। পরদিন রাতে সেই গল্প শেষ করে আরেক নতুন কাহিনী শুরু করে শাহারজাদী যা আরও চমৎকার, আরও মনোগ্রাহী। যাদুর পরশের মতো শাহারজাদীর এই গল্প বলা বাদশাহকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দেয়। সে একেবারে নড়তে পারে না এমন জমজমাট কাহিনী। এভাবে রাতের পর রাত শাহারজাদী একের পর এক অভিনব গল্প শোনাতে থাকে বাদশাহকে, কখনো প্রেমের গল্প, কখনো বিচ্ছেদের, কখনো হাস্যরসাত্মক, কখনো যৌন উত্তেজক, কখনো-বা শুধুই কবিতা। এইসব কাহিনি বা কাব্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশই চেনা পৃথিবী থেকে নেওয়া। কখনো তা পঠিত কোনো বই থেকে উদ্ধৃত। কখনো বা তা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বা স্থান নিয়ে রচিত। কখনো তা নেহায়েত যাদুবাস্তবতার গল্প। আর এ শুধু তো গল্প বা কাহিনী নয়, গল্প বলার কলা ও কৌশলও যা শাহরিয়ারের মতো বাদশাহকে তার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়ে দেয়। এভাবে শাহারজাদী তার বুদ্ধি, সহমর্মিতা, সৃষ্টিশীলতা ও কৌশল দিয়ে রাতের পর রাত নিত্য নতুন গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে শুধু নিজের নয়, রাজ্যের আরও অনেক মেয়ের জীবন বাঁচায়।

## চিত্রাঙ্গদা

মেয়েটির পা দু'খানা গিয়ে পড়ল হিমালয়ের পাদদেশে মণিপুর রাজ্যে। আর সেই পা থেকে জন্ম নিল মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা তার নির্মেদ দীর্ঘ পা দুখানি নিয়ে শুধু যে হরিণের মতো অতি দ্রুত ছুটে চলতেই পারে তা নয়,

ছোটবেলা থেকেই তলোয়ার-যুদ্ধেও সে হয়ে ওঠে সকলের সেরা। তার ধনুক থেকে নির্গত তীর কখনো লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হতে না হতে চিত্রাঙ্গদা রণশাস্ত্রের সকল শাখায় অভূতপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়ে একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। মণিপুরকে বাইরের কোনো শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল জনগণের প্রধান ভরসা *রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে তৈরি করে* নিতে চিত্রাঙ্গদার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। সে পুরুষের বেশে সারা রাজ্যময় এমন কি বনেজঙ্গলেও ঘুরে বেড়ায় নির্ভয়ে। পড়াশুনা, যোগব্যায়াম, অস্ত্রচালনা, এসব বিভিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দিন কাটে চিত্রাঙ্গদার। নারী বলে সে নিজেকে আলাদা মনে করে না। পুরুষ যা করতে সক্ষম সেটা করতে সে নিজেও সমর্থ এটাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে চিত্রাঙ্গদা। তার জীবনযাপন ও দৈনন্দিন কার্যকলাপে সেটাই প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়। চিত্রাঙ্গদা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে যখন সে লক্ষ করে সনাতন পুরুষ নারীদের হয় দাসী অথবা দেবী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। পুরুষের পাশাপাশি সহঅবস্থানের সুযোগ এবং তাদের সমান মর্যাদা নারী কখনো ভোগ করতে পারে না। এই ব্যাপারটা চিত্রাঙ্গদাকে দারুণভাবে পীড়া দেয়। এরই ভেতর একদিন হঠাৎ বনের ভেতর অর্জুনকে দেখে সুপ্ত নারীসত্তা জেগে ওঠে চিত্রাঙ্গদার এবং তাৎক্ষণিকভাবে সে অর্জুনের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু *সে জানে তার এই পুরুষালি বেশ ও চালচলন অর্জুনের পছন্দ হবে না।* ফলে অর্জুনের মনজয় করার বাসনায় চিত্রাঙ্গদা দৈবগুণে এক পরমাসুন্দরী নারীতে পরিণত হয়। অর্জুন তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায় ও বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বাঞ্ছিত সবকিছু ঘটে যাবার পর চিত্রাঙ্গদার মনে হঠাৎ এক গভীর অনুশোচনা ও সংকোচ দেখা দেয়। তার কেবলই মনে হতে থাকে, অর্জুনের সঙ্গে সততার পরিচয় সে দেয়নি। তীব্র অনুতাপ থেকে সে তার প্রকৃত স্বরূপ অর্জুনের কাছে প্রকাশ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কেননা, চিত্রাঙ্গদা বোঝে, যে রূপ দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়েছে সেটা চিত্রাঙ্গদার আসল রূপ নয়। ইতোমধ্যে মণিপুর আক্রমণ করে বসে বহিরাগত এক শত্রুবাহিনী। রাজ্যের জনগণ চিত্রাঙ্গদার মুখের দিকে চেয়ে থাকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে। তখন অবিকল সেই আগেকার যোদ্ধার বেশে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ পরিচালনা শেষে মণিপুর রক্ষা করতে সমর্থ হয় চিত্রাঙ্গদা। আর অর্জুন চিত্রাঙ্গদার এই নতুন রূপ– এই বীরত্ব দেখে অভিভূত। চিত্রাঙ্গদার পুরুষালি পোশাক তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না, বরং তার মুগ্ধতা বাড়ায়। চিত্রাঙ্গদার বুকের ওপর থেকেও এতদিনে এক ভারী পাথর নেমে যায়। অর্জুনকে সে আর মিথ্যা দিয়ে বেঁধে রাখছে না, এই বোধ তাকে শান্তি দেয়-পরিতৃপ্ত করে।

## কালী

মেয়েটির গলাকাটা মাথাটি গিয়ে পড়ল যেখানে সেখান থেকে জন্ম নিল মহা শক্তিধর এক নারী দেবতা, নাম যার কালী, শিবের সহচারিণী। জগৎ ও স্বর্গের সকল শক্তি পরাজিত হলে, সকল উপায় অকার্যকর প্রমাণিত হলে, অসুর আর দানবকে বধ করার জন্যে কালী এসে মর্ত্যে আবির্ভূত হন। পৃথিবীর এই দুঃসময়ে শিব সহ সকল দেবতারা মিলে স্থির করেন কালীর আবির্ভাব মর্ত্যে একান্তই জরুরি এই মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে দেবকুলের নির্ধারিত চরম স্থান মর্ত্যে এসে হাজির হন সেই টুকরো টুকরো করা মেয়েটির গলা কাটা মাথাটির খোঁজে যার থেকে কালীর সঞ্চার ঘটানো হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাতে ঘটে যায় এক মহাবিপর্যয়। কালীর জন্ম হয় সেই কর্তিত ও খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষেপিত কাটা মুণ্ডু থেকেই, তবে একটু বিচিত্রভাবে, যেটা ঠিক পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। মেয়েটির খণ্ডিত মাথাটি যেখানে গিয়ে পড়েছিল সেখান থেকে মহানগরের সবচেয়ে বড় গণিকালয় খুব দূরে নয়। সেদিনই সন্ধ্যায় সেই গণিকালয়েও একটি গণিকা-কন্যা খুন হয়। ওই পল্লিতে এরকম মাঝে মধ্যে দু'একটা নারীর খুন হবার ঘটনা খুব অসাধারণ বা ব্যতিক্রমী কোনো ব্যাপার নয়। কোনো খরিদ্দার, নাকি কোনো ঈর্ষাকাতর গোপন প্রেমিক অথবা গণিকালয়ের স্বার্থান্বেষী কোনো দালালের সঙ্গে অর্থ নিয়ে অবনিবনা, মেয়েটির ধড় থেকে গলা কেটে মস্তকটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যে দায়ী, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু মৃতদেহের দুটো টুকরোই অর্থাৎ মস্তক ও ধড় দুটোই টেনে এনে গণিকালয়ের লোকেরা ফেলে দিয়েছিল নিকটবর্তী সেই মাঠে, যেখানে অনেক দূর থেকে বাতাসে উড়ে এসে পড়েছিল সেই অবিরত স্বপ্ন-বোনা স্বপ্ন-দেখার মেয়েটির কাটা মুণ্ডুটিও। স্বর্গ থেকে দেবতার চর এসে যখন দেখে সেখানে, মাঠের ওপর পড়ে আছে পাশাপাশি দুটি মস্তক ও একটি ধড়, সে তাড়াতাড়ি করে সঠিক মুণ্ডটি বেছে নিয়ে ওটাকে জোড়া দিয়ে দেয় পাশেই পড়ে থাকা গণিকার ধড়ের সঙ্গে। অতঃপর তাতে প্রাণসঞ্চার করে সে। সব কাজ শেষ হলে, শিব দূর থেকে মন্ত্র পড়ে তাকে কালীতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু কেউ তখনো জানে না যে, মুণ্ডুটা সেই অসাধারণ, স্বপ্নচারী ও ব্যতিক্রমী মেয়েটির হলেও শরীরটা একজন গণিকা-কন্যার। ফলে রুদ্রময়ী কালী তাঁর তলোয়ার দিয়ে দুর্জনকে একনাগাড়ে বধ করে গেছেন সত্য, গলায় পরেছেন ব্যবচ্ছেদ করা দুর্জনের খণ্ডিত মুণ্ডুর মালা। নিহত বা আহত অসুরের প্রতি রক্তবিন্দু থেকে একটি করে মহাসুরের নতুন করে জন্ম রোধ করার উদ্দেশ্যে কালী ক্রমাগত রক্ত চুষে নিতে থাকেন তার তাবৎ শিকার থেকে। কিন্তু এই যে বিশাল শক্তিধর, প্রচণ্ড সাহসী, বীর কালী যে বিশ্বসংসারে সংশয় ও শঙ্কাবিহীন বলে পরিচিত, সে কিন্তু রাত হলেই অন্য এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার দেহ, যা আসলে এক

গণিকার দেহ, তাকে প্ররোচিত করতে থাকে গণিকালয়ের খুপরিতে ঢুকে যেতে এবং জানালার পাশে বসে নানান অঙ্গভঙ্গি করে, নেচেকুঁদেগেয়ে, খদ্দেরের মন ভোলাতে, তারপর রাতভর শরীর-শরীর খেলায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। দিনের কালীর ন্যায়পরায়ণতা ও প্রচণ্ড দাপটে দুর্জন বধ আর রাতের কালীর শরীর থেকে উৎসারিত অসীম ভোগের আকাঙ্ক্ষা মিলে যে দেবতার সৃষ্টি হয়, সেই কালীই হয় মানুষের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপন এবং চেনা দেবতা। কেননা, সে শুধুই কল্যাণময়ী, শুধুই দুর্জনবধকারী, শুধুই সকল ভালো এবং দেবতুল্য গুণের সমন্বয় নয়, সে কেবলই শক্তির প্রতীক নয়; তার মস্তিষ্ক যাই বলুক, তার শরীর লালায়িত হয়ে ওঠে পুরুষসঙ্গ লাভের জন্যে, উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী আকর্ষণীয় শরীর নিয়ে প্রকাশ করে তার ভোগের জন্যে কাতরতা। বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে আকর্ষণ করার জন্যে বিভিন্ন ছলাকলা তাকে মানবিক করে তোলে। ভালো ও মন্দের একত্র সহবাস, একই শরীরে ভক্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা কালী দেবীকে আমাদের কাছের মানুষ বানিয়ে ফেলে। একজনের দেহ ও অন্যজনের মুণ্ডু দিয়ে গড়া এই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের কবন্ধ কালীকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন উপকথা নিয়ে গল্প রচনাকারী বিখ্যাত নারী লেখক মার্গারিত ইউর্সেনার, বেলজিয়ামে যাঁর জন্ম এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার যৌথ নাগরিক ছিলেন যিনি।

## সতী

মেয়েটির কান দুটো থেকে জন্ম নিল সতী। হিমালয়ের কোলে ছোট্ট এক রাজত্বে বাস করে প্রবল আত্মম্ভরী এক রাজা, যার নাম দক্ষ। দক্ষের ঘরেই জন্ম নেয় সতী। বড় হবার পর শিবকে দেখে ও তার কথা শুনে সে প্রেমে পড়ে। পিতার অপছন্দ সত্ত্বেও শিবকেই বিয়ে করে সতী। এতে সতীর পিতা খুবই মনোক্ষুণ্ন হয়। এই বিয়ের কিছুকাল পরে মূলত শিবকে অপমান করার জন্যেই দক্ষ রাজা শিব ও সতী ব্যতীত চারপাশের সকল পরিচিত ও গণ্যমান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। কথাটা কানে গেলে সতী শুধু যে বিস্মিতই হয় তা নয়, প্রচণ্ড আহতও হয়। সেই সঙ্গে সে মনকে এটাও বোঝায়, নিজের বাবার বাড়িতে যাবার জন্যে আনুষ্ঠানিক নেমন্তন্নের প্রয়োজনই-বা কী? ফলে সে ঠিক করে বিনা নেমন্তন্নেই যাবে সেখানে। শিব তাকে পুনঃপুন বারণ করে যেতে, কেননা সে বোঝে এর ফলাফল ভালো হবে না। কিন্তু সতীর জেদের কাছে অবশেষে হার মানতে হয় শিবকে। তারপরেও শিব অনুরোধ করে সতীকে, যাতে সে তার বাবার সঙ্গে কোনো কথা কাটাকাটি বা তর্কে না যায়। সতীকে বিশেষভাবে শিব বলে দেয় যেন সে ওই বাড়ির কারো মুখে, বিশেষ করে দক্ষ রাজার মুখে, শিবের নিন্দা না শোনে। কেননা শিব ভালো করেই জানে সতী তা সইতে পারবে না। যদি তারা সত্যি সত্যি ও ধরনের কথা ওঠায়, সতী যেন

সচেতনভাবে তা না শোনে এবং প্রয়োজনে তার কান দুটো যেন তখন বন্ধ করে রাখে। সতী বাবার বাড়িতে গিয়ে দেখে সেখানে সকলেই তার প্রতি কেমন ঠাণ্ডা আচরণ করছে এবার। সতী বোঝে, এ বাড়িতে আগেকার সেই অবস্থান বা আদর আর নেই তার। আহত, বিমর্ষ সতী পিতাকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, এত নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে কেমন করে তার স্বামীর একটু জায়গা হলো না এ বাড়িতে। উত্তেজনায়, অপমানে সতী ভুলে যায় শিব তাকে কী প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল। সে কান খাড়া করে শোনে তার বাবা কীরকম করে সবিস্তারে শিবের নিন্দা করছে। দক্ষ রাজা সোজাসাপটা বলছে, ছেঁড়া তেনা বা বাঘের ছাল পরিহিত, জটা মাথায়, ছাই-ভস্ম গায়ে-মাখা, নেশাখোর সেই লোক– অর্থাৎ সতীর স্বামী, সাপ আর ত্রিশূল হাতে নিয়ে আর যাই করুক, এমন উঁচু পর্যায়ের অতিথিদের সঙ্গে এসে একত্রে বসতে পারে না। সতী স্পষ্ট বোঝে তার স্বামীর প্রতি তার পিতার শুধু যে কোনো শ্রদ্ধা নেই তাই নয়, দক্ষ রাজা শিবকে রীতিমতো ঘৃণাও করে। এটা বুঝতে পেরে মনের দুঃখে সতী তক্ষনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। সতীর এরকম করুণ মৃত্যুর খবর শুনে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ন শিব তার দলবল নিয়ে দক্ষরাজ্য আক্রমণ করে এবং অনায়াসে দক্ষ রাজাসহ তার পুরো সেনাবাহিনীকে খুন করে গোটা রাজ্য তছনছ করে দেয়। তারপর সতীর মৃতদেহটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ত্রিভুবন ধ্বংস করে ফেলতে পারে এমন প্রলয়নাচন নাচতে শুরু করে। শিবের এই উন্মাদের মতো প্রচণ্ড ও অবিরাম নাচের দমকে সমস্ত চরাচর যখন প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার যোগাড়, তখন জগৎকে রক্ষা করার জন্যে সকল দেবতারা একসঙ্গে মিলে বিষ্ণুর কাছে এসে ধন্না দেয়। বাধ্য হয়ে বিষ্ণু তার চক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। কাঁধ থেকে সতীর দেহ উধাও হয়ে যাবার পর তবেই তার প্রলয়নাচন বন্ধ করে শিব। আর সেই সঙ্গে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় পৃথিবী। বিষ্ণুর ইচ্ছায় অতঃপর সতীর পুনর্জন্ম হয় পার্বতী হিসেবে, যে বড় হয়ে পুনরায় শিবকেই বিয়ে করে।

এ কথা সকলেই জানে যে বিষ্ণুর চক্রে খণ্ডিত সতীর দেহ থেকে পুনরায় জন্ম নিয়েছিল পার্বতী।

কিন্তু এটা বোধহয় অনেকেরই জানা ছিল না যে ব্যবচ্ছেদ করা নারীর শরীর থেকে শুধু পার্বতী বা উমা নয়; দুর্গা, আয়েশা, সীতা, রাধা, রুথ, আম্রপালি, এথেনা, তুবা, শাহারজাদী, চিত্রাঙ্গদা, কালী ও সতীর মতো মেয়েরা বারবার ফিরে ফিরে আসে। হয়তো অন্য কোনো নামে, হয়তো অন্য কোনো দেশে, হয়তো অন্য কোনো সময়ে।

কিন্তু তারা আসে– আসবে।

# জোছনা করেছে আড়ি

আনন্দধারায় প্লাবিত ভুবন। চারদিকে মহোৎসব। সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, খাওয়াদাওয়া। রং-বেরঙের পোশাকে সজ্জিত শিশু বালক-বালিকা, তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অসীম পুলকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। দখিন হাওয়ার লুটোপুটি। মাতামাতি। তাজা ফুলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, নীল, মিসিসিপি, আমাজন কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে আনন্দ ছড়িয়ে। ময়না, টিয়া, দোয়েল, রবিন অনবরত শিস দিচ্ছে। কিন্তু কেন? কিসের এই উৎসব? এত আনন্দের উৎসটা কী?

সৌরজগতের মহাসম্রাট সূর্য ও প্রাণচঞ্চলা পরম লাবণ্যময়ী পৃথিবীর একমাত্র সন্তান ষোড়শী পূর্ণিমা যাবে আজ প্রণয়ী চন্দ্রের সঙ্গে প্রথমবারের মতো মিলিত হতে। আনন্দ তাই বাঁধ মানে না। প্রচণ্ড তোলপাড়। হুলস্থুল। অপরূপ সাজে সজ্জিতা ধরিত্রী তাই উন্মুখ, বিমোহিত।

পূর্ণিমাকে ঘিরে সখীরা আলাপচারিতায় মেতে ওঠে। ঘনিষ্ঠতম সহচরী প্রকৃতি গাছগাছড়া থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে তাজা ও সুমিষ্ট ফল কুড়িয়ে এনেছে পূর্ণিমার দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য। গোলাপ, জবার সূক্ষ্ম রেণু ঘষে প্রভাতী শিশির আর চন্দনের সাথে যোগ করেছে মুখমণ্ডলে প্রলেপ দেবার জন্য।

বান্ধবীদের অনুরোধে ধবল গাইয়ের ননীমাখা দুধে হলুদের পরশ মাখিয়ে স্নান সমাপন করে পূর্ণিমা। তার কোমর অবধি কালো কোঁকড়া চুলে গন্ধরাজ আর নারকেলের তেল মাখিয়ে দেয় প্রকৃতি। মৌমাছি ও প্রজাপতি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে মধু। মধুর সঙ্গে ননী আর সতেরো রকম ফলের রস মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিশেষ এক পাণীয় যা পান করে পূর্ণিমার মসৃণ মোলায়েম কণ্ঠ আরও মধুর, আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে চন্দ্রের কাছে। মিহি তাঁতে বোনা নরম রেশমি ফুলেল পোশাকে অপরূপা হয়ে ওঠে পূর্ণিমা। তার খোঁপায় গুঁজে দেয় প্রকৃতি মস্ত বড় এক সূর্যমুখী চোখের পাতার ওপর অপরাজিতার নির্যাস। গায়ে ছড়িয়ে দেয় সাত মহাদেশের সাতটি সেরা ফুল থেকে আহরিত আতর। গালে গোলাপের আভা, গলায় সপ্ত রঙের ফুলের মালা।

পরম তৃপ্তিতে পূর্ণিমা বাইরের দিকে তাকায়। এত ভালোবাসাও রয়েছে সকলের মনে তার জন্যে? শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষে আজ গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতা। প্রতিটি ফুলগাছে একসঙ্গে ফুটে উঠেছে বর্ণিল পুষ্পরাজি। আকাশ পরিপূর্ণ নীল। নেই এক ফোঁটা মেঘ। পিতা সূর্য মুখ টিপে হাসছে।

পরিতৃপ্ত পর্বিত পিতা তার কন্যার এই মাহেন্দ্রক্ষণে, এই বিশেষ সন্ধিলগ্নে অশেষ শুভেচ্ছা জানায়। সর্বংসহা পরম স্নেহশীল জননী পৃথিবী বুকে জড়িয়ে ধরে পূর্ণিমাকে।

'খুব সাবধানে থাকিস্ পূর্ণিমা। তোর মঙ্গল হোক। সুখী হ' মা। আনন্দে থাক্।'

মা-বাবার কাছে বিদায় নিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে উষ্ণ আলিঙ্গন করে অতঃপর রওনা হয় পূর্ণিমা চন্দের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর শেষ সীমান্ত পর্যন্ত সঙ্গে আসে প্রকৃতি। আসে বনানী, আসে টগর, হাওয়া, প্যারাকিট, কোকিল, ময়না, দোয়েল।

এরপর যেতে হবে একা পূর্ণিমাকেই। সখীরা কাঁদে। পূর্ণিমার হৃদয়েও তোলপাড়। এতদিনের চেনা ভুবন ছেড়ে নতুন এক জগতে, নতুন এক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পূর্ণিমা। শঙ্কা তো স্বাভাবিক। তবু এরই ভেতর আছে এক অবর্ণনীয়, অভূতপূর্ব উত্তেজনা। আছে উন্মাদনা, আকর্ষণ। অজানারে জানতে গিয়ে, প্রিয়তমের সান্নিধ্যলাভে কাতর পূর্ণিমা বিদায় জানায় শেষ সহযাত্রীদের। এবারকার এই শেষ পথটুকু চলতে হবে তাকে একা, সম্পূর্ণ একা।

দিনের শেষ। সায়াহ্নে সূর্য অস্ত গিয়েছে। ফিরেছে দিনশেষে নিজের ঘরে। চন্দ্র তখনো পর্যন্ত প্রিয়সঙ্গলাভের প্রস্তুতিতে আপন কক্ষেই বিচরণ করছে। চারদিকে তাই সাময়িকভাবে আলোর অপর্যাপ্ততা। একটু একটু ভয় বোধ করছে পূর্ণিমা। তবু আশায় ভর করে, মনে আনন্দ সঞ্চার করতে চেষ্টা করে সে। পূর্ণিমা জানে আর কিছুক্ষণ পর চন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণিমার মিলন ঘটলেই জোছনায় ভেসে যাবে পৃথিবী। খিলখিল করে হাসতে থাকবে প্রকৃতি, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, অতলান্তিক, প্রশান্ত, ভূমধ্য ও আরব সাগর। নদীতে জোয়ার আসবে। জেলেরা মহোৎসবে মেতে উঠবে। ব্যবসায়ীরা পাল তুলবে বজরায়। প্রেমিক-প্রেমিকা মিলনের বাসনায় জোছনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। উজ্জ্বল আলোতে গোলাকার শুভ্র সুদর্শন চন্দ্রকে দেখে আপ্লুত হবে শিশু। মায়েরা সান্ত্বনা দিয়ে শিশুকে শোনাবে 'আয়, আয় চাঁদমামা, টিপ দিয়ে যা।' যদিও তারা ভালো করেই জানে পূর্ণিমাকে ছেড়ে চাঁদ কখনোই আসবে না শিশুর কপালে টিপ দিয়ে যেতে।

পায়ে পায়ে এগোয় পূর্ণিমা। বুক টিপে টিপে করছে তার। কিছুটা শঙ্কা, কিছুটা উত্তেজনায়। আর তো একটুকু পথ। এসে পড়ল বলে পূর্ণিমা।

কিন্তু হায়! হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সাদা কালো মেঘ এসে সুবিশাল নীল আকাশটাকে মুহূর্তে ঢেকে ফেলল। ভয়ঙ্কর গর্জন করে মেঘ ডেকে উঠল। একনাগাড়ে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। আসলে পূর্ণিমার জীবনের এই মুহূর্তটির জন্য অসীম আগ্রহে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল আরও একজন। সে আর কেউ নয়। স্বয়ং শনি দেবী। হিংসুটে শনি পৃথিবীকে কখনো ক্ষমা করতে পারেনি। শনির বাসনাসিক্ত আবেদনে সূর্যের সাড়া না দেবার কারণ হিসেবে শনি

বরাবরই পৃথিবীর প্রতি সূর্যের দুর্বলতাকেই দায়ী করে এসেছে। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলে, নাম বদলে, নেচে গেয়ে হেসে সূর্যকে পৃথিবী এমন পাগল না করলে কী সাধ্য ছিল তার শনিকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার? ধিক্ পৃথিবী, ধিক্। শনি প্রবল ক্ষোভে, অভিমানে, বেদনায় পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। কত রং, কত ঢং, কত নাম– ধরিত্রী, ধরা, পৃথিবী, ধরণী, জগৎ, ভুবন, বসুন্ধরা, আরও কত কী! অথচ শনি? সে একা, অদ্বিতীয়। তার দ্বিতীয় নাম যেমন নেই– তেমনি নেই দ্বিতীয় সত্তা। অন্ধকারে থাকে বলে অন্ধকারেই প্রিয়জনকেও টেনে নিতে চায় সে। সূর্যের উজ্জ্বল আলো আর বেশি খোলামেলা অভিব্যক্তি শনির সান্নিধ্যে, তপস্যায় ক্ষীণ হয়ে আসছে, আনন্দে পরিতৃপ্তিতে বসবাস করবে দু'জনে অন্ধকার রাজত্বে। এই এতটুকু স্বপ্নই তো ছিল শনির। কিন্তু পৃথিবীর জন্য তা ঘটতে পারল না। পৃথিবীর প্রেমে মাতোয়ারা সূর্যদেব শনিকে প্রত্যাখ্যান করল। এ অপমান কী করে সইবে শক্তিমান শনি। ফলে সূর্য পৃথিবীর কাউকে না পেয়ে তাদের সন্তানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়াই ঠিক করেছে শনি।

আর তাই তার দুই সহচর, রাহু আর গ্রহণ, পথের ক্রান্তিতেই অপেক্ষা করছিল পূর্ণিমার জন্য। শনির নির্দেশে গ্রহণ এসে চন্দ্রকে আড়াল করে দাঁড়াল। নিমেষে অন্ধকার নেমে এলো। পথভ্রান্ত পূর্ণিমা যখন ভয়ে দিশেহারা, রাহু এসে গ্রাস করল তাকে। কুমারী, অধরা পূর্ণিমার সর্বাঙ্গে রাহু রেখে দিল তার বাসনার চিহ্ন। পূর্ণিমার রেশমি পোশাক সহস্র টুকরোয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। সমস্ত শরীর দলিত মথিত। পূর্ণিমার নরম মসৃণ গালে, ওষ্ঠে রাহুর পাশবিক দংশনের রক্তচিহ্ন। রাহু আর গ্রহণ পালাক্রমে চন্দ্রকে পাহারা আর পূর্ণিমাকে ধর্ষণশেষে এক সময় পালিয়ে গেল গহিন বনে। শনির যাদুমন্ত্রে এতক্ষণ ধরে চন্দ্র কিন্তু ভাবছিল সে মিলনের আগে কেবল নিয়ে নিচ্ছে এক স্বল্পকালীন সৌন্দর্যনিদ্রা। ঘুম ভেঙে সামনে পূর্ণিমার এই লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে চন্দ্র চিৎকার করে ওঠে। পূর্ণিমা কোনো কথা না বলে চন্দ্রের দুই গালে বসিয়ে দেয় দুটো চড়। তারপর দুই হাত দিয়ে, হাতের নখ দিয়ে চন্দ্রকে ক্ষতবিক্ষত করে পূর্ণিমা জানতে চায়, এ কেমন প্রেমিক সে, যে পারে না দস্যুর হাত থেকে প্রেমিকাকে রক্ষা করতে, অন্তত একটু সাহস দেখিয়ে এগিয়ে আসতে? কোনো কথা বলে না চন্দ্র। সেই থেকে চন্দ্রের মুখে স্থায়ী হয়ে থাকে এবড়ো-থেবড়ো কালিমা, যাকে পৃথিবীর সকলে 'চাঁদের কলঙ্ক' বলে জানে, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে প্রতি সন্ধ্যায়। চন্দ্রের সকল কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে পূর্ণিমা সে অবস্থাতেই তক্ষনি ফিরে আসে মাতৃ-আলয়ে। ক্রন্দনরতা পৃথিবী নিঃশর্তভাবে পরম মমতায় কন্যাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঘরে তুলে আনে। সূর্য আর পৃথিবী কারোরই বুঝতে অসুবিধা হয় না এ কার কারসাজি। সূর্যদেব প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। এরপর চারদিন চার রাত্রির সমপরিমাণ সময় পার হয়ে যায়। না উদিত হয় সূর্য, না চন্দ্র। রাগে, দুঃখে, অপমানে পৃথিবী আর পূর্ণিমার জীবনের দুই প্রধান পুরুষই স্বেচ্ছায় অন্তরীণ হয়ে থাকে।

ফলে চারদিকে থিক্‌থিক্ করে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও এক ফোঁটা আলোর আভাস নেই। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে জনগণ। আলো আর উত্তাপের অভাবে দিশেহারা লোকজন মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা আর হতাশায় ভুগতে থাকে। দলে দলে লোকে আত্মঘাতী হতে শুরু করে। সমুদ্রে, নদীতে উথালপাথাল ঢেউ নেই— জোয়ারভাটা। আকাশের নীলিমাকে ঢেকে রেখেছে ঘনকালো মেঘ। একনাগাড়ে চলছে বৃষ্টি আর ঝড়। একে একে পড়ছে সকল শস্যক্ষেত্র, ফুল, গাছ, বৃক্ষ। পাখির গুঞ্জন থেমে গেছে। মরা গাছে বসে ঝিমুচ্ছে কোকিল। কণ্ঠে নেই তার গান। প্রজাপতির ডানার রং খসে পড়েছে। সব ফুল ঝরে পড়ার আগে রংহীন সাদা হয়ে যাচ্ছে। চারদিক স্যাঁতসেঁতে ভিজে।

এ অবস্থায় পৃথিবী হন্যে হয়ে পড়ে সূর্যের দরবারে। সূর্য আর চন্দ্রকে কিছু করতেই হবে। তা নইলে পুরো জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। চন্দ্র সূর্য দুজনেরই এক কথা। একমাত্র পূর্ণিমাকে স্থির করতে দিতে হবে শনি, রাহু আর গ্রহণের শাস্তি। তাদের মৃত্যুদণ্ড কীভাবে কার্যকর করা হবে। পূর্ণিমা যদি তা করে, তাহলেই আবার সূর্য উদিত হবে। আলোয় ঝলমল করবে পৃথিবী। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে আবার উদ্ভাসিত হবে চন্দ্র।

পৃথিবী নিরুপায় হয়ে ছুটে যায় বিধ্বস্ত পূর্ণিমার কাছে। প্রতিকার চায় কন্যার কাছে। 'কঠিনতম শাস্তি দে মা পাষণ্ডদের। ওদের হত্যার মধ্য দিয়ে তোর প্রতি অপরাধের যোগ্য বিচার হোক, সৌরজগৎ-সংসার বেঁচে যাক।'

কিন্তু পূর্ণিমা চায় না এত সহজে ওদের মুক্তি দিতে। তার কাছে শাস্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু একবার নয়, বারবার হতে হবে সেই মৃত্যু। আর জীবিতাবস্থায়ও ধুঁকে ধুঁকে মরবে তারা।

পিতা সূর্যকে ডেকে পূর্ণিমা সোজা জানিয়ে দেয়, শনির শাস্তি কী দেবে সেটা তোমার ব্যাপার। আমি তাতে নাক গলাব না; কিন্তু রাহু আর গ্রহণের শাস্তি আমি স্থির করেছি। একমাত্র এভাবে এটা কার্যকর হলেই আমি রাজি।

কন্যা পূর্ণিমার বিশদ পরিকল্পনা শুনে সূর্য বললেন, তথাস্তু।

চন্দ্রও নিঃশর্তভাবে তা অনুমোদন করল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আলো ফুটে উঠল। উদিত হলো সূর্য ও পরে চন্দ্র।

অন্ধকারে বসবাসকারী শনির শাস্তি হলো নীরবে নিজ কক্ষপথে ক্রমাগত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা। আর সেই থেকে সৌরজগতের সকল প্রাণীর সমস্ত অন্যায়, অবিচার, ব্যর্থতার জন্য দায়ী হয়ে রইল শনি। অশুভের প্রতীক বলেই চিহ্নিত হয়ে রইল সকলের মনে।

রাহু ও গ্রহণকে বন থেকে খুঁজে বের করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। পূর্ণিমার ইচ্ছায় ওরা পাবে একটি মানবজীবন ও লক্ষ কোটি কীটের জীবন।

একটি দীর্ঘ মানবজীবন অন্ধকার কারাগারে ওদের বাস করতে হবে। আলোর মুখ দেখবে মাসে মাত্র একবার যেদিন পূর্ণিমা যাবে চন্দ্রের সাথে মিলিত হতে। চন্দ্র আর পূর্ণিমার মিলনে জ্যোৎস্নার সৃষ্টি হবে। আর সেই জ্যোৎস্নায় তখন ভেসে যাবে পৃথিবী। লোহার গরাদ ভেদ করে লম্বা লম্বা ফালি ফালি জ্যোৎস্না চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকবে ওদের শীতল স্যাঁতসেঁতে কারাগারে। সেই রাতে শুধু পূর্ণিমা আর চন্দ্রের মিলনই ঘটবে না, পৃথিবী জুড়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন ঘটবে সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে। কারাগারের নির্জন ঠাণ্ডা কুঠুরিতে বসে ওরা দূর থেকে শুনতে পাবে প্রেমিক-প্রেমিকার খিলখিল হাসি, কানাকানি, ফিসফিস প্রেমালাপ, শুনবে বসন পতনের শব্দ, চুড়ির আওয়াজ, মিলনের ধ্বনি। ওরা কারাগারে বসে তখন ক্রমাগত ছটফট করবে। তারপর আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে জ্যোৎস্না সরে যাবে। আরেকটি পূর্ণ মাসের জন্য অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে ওরা। এভাবেই কেটে যাবে ওদের মানবজীবন। আর মৃত্যুর পর?

মৃত্যুর পর ওরা দুজনেই কোটি বার জন্ম নেবে এক বিশেষ শ্রেণির পুরুষ কীট হিসেবে। ওদের জীবন হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র আট থেকে দশ সপ্তাহ বাঁচবে ওরা; কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটে যাবে ওদের সঙ্গিনীর খোঁজে। সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করতে। নারী বন্দনায়। কত সহস্র আকুতি-মিনতি করবে ওরা নারী কীটের কাছে। অধিকাংশ সময়েই নারী কীট সাড়াও দেবে না সেই ডাকে। এই বিশেষ কীটদের নারীটির দেহের ওজনের তুলনায় পুরুষ কীটগুলোর দেহ হবে খুবই ছোট। শতকরা এক থেকে দুই ভাগ মাত্র। নারী কীটের সূক্ষ্ম মসৃণ পর্দার মতো ঘরের দরজায় এসে রং-বেরঙের হাত-পা নাড়িয়ে এই দুই পুরুষ কীট অনবরত বাদ্যযন্ত্র বাজানোর চেষ্টা করবে, অঙ্গভঙ্গি করে নারীটিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস পাবে; কিন্তু নারী কীট ওদের দিকে ভালোমতো নজর দেওয়ার আগেই অধিকাংশ সময় তাদের মৃত্যু হবে। ওদের স্বল্প আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে নারীর মন যোগাতে যোগাতেই; সে নারী তাদের হয়তো লক্ষও করবে না। লক্ষ করলেও হয়তো তাদের অগ্রাহ্য করে অন্য কোনো পুরুষ কীটকে সম্মতিসূচক জবাব দেবে। ওদের অবজ্ঞা করে ওদের সামনেই অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে। আর যদি কখনো রাহু বা গ্রহণ কীটের ডাকে সাড়া দেয়ও, সঙ্গমের চরম মুহূর্তে সেই নারী কীট তাদের প্রেমিককে হঠাৎ ভক্ষণ করতে শুরু করবে। মিলন-শেষে তাই আর পুরুষ কীটের অস্তিত্ব থাকবে না। পুরো দেহ চলে যাবে নারী কীটের পাকস্থলীতে। নারী কীটটি অবশ্য একবার পুরুষ ভক্ষণ করলে পুনরায় পুরুষ-সঙ্গকাতর হবে না।

পূর্ণিমার সেই অভিশাপ থেকেই মাকড়সা প্রজাতির জন্ম। অন্ধকারে, নির্জন, পরিত্যক্ত জায়গায় পৃথিবীর সর্বত্র যে আজো মাকড়সার বসবাস সেটার শুরু পূর্ণিমার অভিশাপেই। রাহু আর গ্রহণের শাস্তির মধ্য দিয়ে।

জ্যোৎস্নার আলো তাই কখনো পৌঁছায় না মাকড়সার জালে।

# একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত

এমন আজব ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি। গত বিশ বছর ধরে এই জনপদে কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এও কি সম্ভব? কিন্তু যতদূর খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘটনাটা সত্য। একদল জনসংখ্যাবিশারদ ও বিজ্ঞানী এসেছেন অনুসন্ধানে। না, জন্মের হার কম নয় এ সম্প্রদায়ের। বরং জাতীয় গড় হারের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশিই। সেটা অবশ্য অনুমেয় কারণেই। কেননা অশিক্ষিত, সভ্যতার সাথে অসম্পৃক্ত এই জনগোষ্ঠী জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক সকল পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নয়। কিন্তু তাহলে শুধুই কেন পুত্রসন্তান? এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। শোনা যায়, প্রথম প্রথম উৎফুল্লই ছিল জনগণ রোজগেরেদের পুনঃপুন আবির্ভাবে। এক একটি ছেলে তো নয়, বাবার সঙ্গে কাঠ কাটার যোগানদার। কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বাক্স, আসবাব বানাবার কারিগর। একটা সময় ছিল সবাই প্রত্যাশা করত, একরকম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত একটি পুত্রসন্তানের জন্যে। কিন্তু তারপর, যখন দেখা গেল মাসের পর মাস বছরের পর বছর এখানে আর একটিও কন্যাসন্তান জন্ম নিচ্ছে না, তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই চন্দনকর সম্প্রদায় এর আগে কখনো নিজেদের সমাজ ছেড়ে বাইরে ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেনি। এখন তারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন, সম্পূর্ণ চন্দনকর গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিনা। কার অভিশাপ লাগল? কী দোষে এমন সর্বনাশা পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দনকারেরা? একেক জন একেক কথা বলে। কার কথা বিশ্বাস করবে লোকে? তবে সবাই একটি ব্যাপারে একমত। মানব-ইতিহাসে কোথাও কখনো যা দেখা যায়নি, তাই ঘটছে গত দু'দশক ধরে এই সমাজে। এখানে আর কোনো কন্যাসন্তান জন্ম নিচ্ছে না। এছাড়া আরও কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনও লক্ষ করা যাচ্ছে এই নারীকুলে। বিষয়টা ভাবার মতো। একটু তলিয়ে দেখা যাক কী হয়েছিল এখানে।

## পটভূমি

জায়গাটা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে। সুন্দরবনের বদ্ধ জলাভূমির পশ্চিম পার্শ্বে। চন্দনকর সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বসতি এখানে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দেমশা'র মতো পরিবার। ওরা দেখতে বেঁটেখাটো, ফরসা চ্যাপ্টা, চোখগুলো ফোলা-ফোলা। অনেকটা চীনদেশীয় লোকদের মতো। মেয়েদের পরনে লুঙ্গিজাতীয় লম্বা পোশাক। ওপরে ছোট তাহার ব্লাউজ। ছেলেদের গায়ে মালকোছা দেওয়া চার

হাত কাপড়। আর ঘাড়ের ওপর একখানা গামছা। এখানে এক সময় প্রচুর চন্দন কাঠে ছিল। চন্দনকরদের পেশাই ছিল চন্দন কাঠ দিয়ে নানান রকম নকশার ঘর সাজাবার জিনিস তৈরি করা। চন্দন ঘরে রূপচর্চার উপকরণ ও সুগন্ধি বানানো। এখন চন্দন কাঠের পরিমাণ কমে গেছে। কিন্তু তাদের জীবিকা বদলায়নি। এখানকার লোক এখনও আগের পেশাতেই রয়েছে। চন্দনের বদলে যোগ হয়েছে সেগুন, শাল, কাঁঠাল আর কড়ুই। কাঠ সংগ্রহ আর কাঠের ছোটখাটো আসবাব ও টুকিটাকি ঘর সাজাবার উপকরণ তৈরি করেই সময় কাটে তাদের। এসব হাতে-তৈরি জিনিস নিয়ে যাবার জন্যে শহর থেকে লোক আসে মাঝে মাঝে। লবণ, তেল, কেরোসিনের বিনিময়ে কিনে নিয়ে যায় সেসব পণ্য। মেয়েরা কাঠের কাজ ছাড়াও খেতের কাজ করে। শিশুদের রয়েছে এক বিশেষ স্থান এ সম্প্রদায়ের ভেতর। শাসন করার জন্যে বাচ্চাকে মারধর করা বা ধমক দিয়ে ভয় দেখাবার কথা ভাবতেও পারে না এরা। শিশু মানেই স্বর্গীয় এক বস্তু। সব নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, শাসন থেকে মুক্ত তারা। প্রকৃতির কোলে অতি আদরে বড়ো হয়। একজনের সন্তান অন্য দশজনেও দেখাশুনা করে। শিশু মানেই সুন্দর, মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রতীক। শিশুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বয়স্করা। সামাজিক সকল আচার-আচরণে মা-বাবা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। একটি শিশুর জন্মলগ্নের জন্যে গোটা সম্প্রদায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। ঢাক বাজিয়ে, ঘণ্টা পিটিয়ে গান গেয়ে শিশুর আগমনকে স্বাগত জানায় পড়শিরা। এখানে পুরুষ-নারী উভয়ে সংসারের কাজে, সন্তান প্রতিপালনে ও উপার্জনে অংশগ্রহণ করে। তবে দৈনন্দিন জীবনে বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো পুরুষরাই বেশি করে। মেয়েরা সেসব কাজেরই প্রাধান্য দেয় যে কাজ প্রচুর মনোযোগ ও সমন্বয় দাবি করে।

## মা মায়াবতী, চম্পা দাসী ও বহিরাগত দস্যু

এমনি করে সবকিছু ঠিকঠাক নিয়মমাফিকই চলছিল চন্দনকরদের। এখানে কয়েকশ' বছরের বসতি তাদের। একসময় চাঁদনী খাল আর কুসুমদিঘির স্বচ্ছ জলে সাঁতার কেটে, শাপলা তুলে সমস্ত জলরাশি তোলপাড় করে বেড়াত একরাশ চপল কিশোরী। ঘুঙুর বাজিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটে বেড়াত চঞ্চল বালিকারা। অথচ আজ সারা গাঁয়ে না আছে কোনো অল্পবয়সী তরুণী, না কিশোরী। শিশু কন্যাসন্তান পর্যন্ত নয়। মা মায়াবতী এখানে সবচেয়ে বড়ো দেবতা বলে পরিচিত। সকলেই তার পুজো করে। বিরাট মন্দির আছে মায়াবতীর। চন্দনকরদের সকলের ধারণা, বহিরাগতদের পাশবিক আচরণে ভয়ানক ক্রুদ্ধ মা মায়াবতী। তাঁকে তুষ্ট করতে না পারলে এ অঞ্চলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেন হলো মায়াবতীর এতখনি গোসা?

অনেকে অনেক কথা বলে। তবে যে-কথন লোকমুখে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তা হলো চম্পা দাসীর ওপর অমানবিক অত্যাচারে মা মায়াবতী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। ঘটনাটা প্রথম ঘটে উনিশ শ' একাত্তরে। চক্‌রাবক্‌রা জংলী পোশাক পরে একদল লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল একদিন এই অঞ্চলে। এখানকার সমস্ত শান্তি, নিভৃতি ও শৃঙ্খলা ভেঙে ওরা বন্দুকের প্রচণ্ড আওয়াজ তুলেছিল। পাখিগুলো সব ডানা ঝাপটে বন থেকে উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। ভয় পেয়েছিল চম্পা দাসীও। তখন তার আর কত বয়স? বারো কি তেরো। চম্পার রূপ, লাবণ্য, দীর্ঘ কেশরাশি আর মুক্তার মতো দাঁতের খিলখিল হাসি দেখে এই বিদেশি লোকগুলো মাতাল হয়ে উঠেছিল। স্নানরতা মেয়েটিকে কুসুমদিঘি থেকে তুলে নিয়ে মায়াবতী মন্দিরের ভেতর আটকে রেখেছিল পুরো দুটো দিন। ওরা চলে যাবার পর থেকেই চম্পা আর কথা বলে না। নির্লিপ্ত চেয়ে থাকে সে। হাসে না। কাঁদে না। রাতে ঘুমোয় না পর্যন্ত। এভাবেই কেটে গেছে পুরো চারটি বছর। কয়েক বছর পরে আবার উঠল ঝড়। এবার বিদেশি নয়, চন্দনকরদের শহরে দেশবাসীই, যাদের কথা চন্দনকররা স্পষ্ট বুঝতে পারে অথচ যারা তাদের কথা বোঝে না, এসে চড়াও হলো আবার। এবার চম্পা দাসী আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ষোড়শী রূপসী চম্পাকে এবারও রেহাই দিল না ওরা। এর আগে চারটি বছর ছিল সে মায়াবতীর মন্দিরেই অন্তরীণ। এটা তার স্বেচ্ছানির্বাসন। একাত্তরের পর মা-বাবা আত্মীয়স্বজন অনেক চেষ্টা করেও ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না চম্পাকে। সে সারা দিন বসে বসে মায়াবতীর পুজো করে। মায়াবতীর ভোগের জন্যে ব্রতচারিণীদের আনা কলা, আম, পেয়ারা, সাগুদানা খেয়ে দিনের পর দিন বেঁচে থাকে চম্পা দাসী। এবার দস্যু শহরবাসীর নজর কিন্তু শুধু একটি নারীতেই সীমাবদ্ধ রইল না। একে রাতে বিশাল মশাল ঝুলিয়ে বাজি ও পটকা পুড়িয়ে সম্পূর্ণ গ্রাম তছনছ করে গেল ওরা। চন্দনকরদের প্রতিটি কিশোরী ও যুবতীকে ধর্ষণ করল লাটিসোটা হাতে একদল সরল পুরুষ।

এরপরও সময় থেমে থাকল না। এ কালো রাতও আর দশটা স্বাভাবিক রাতের মতোই শেষ হলো। অন্ধকার কাটল। সূর্যও উঠল যথাসময়। পাখি ডাকল। চাঁদনী খাল আর কুসুমদিঘিতে লাল শাপলা ফুল এতটুকুও বিবর্ণ হলো না। গাছের সবুজ আভা, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বৃষ্টির শীতলতা, দখিন হাওয়ার শিরশির আওয়াজ সব অবিকল তেমনি রইল। কোথাও কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, একটা মারাত্মক, একটা ভয়ানক পরিবর্তন শুরু হলো চন্দনকর অঞ্চলের সমস্ত নারীকুলে। হঠাৎ করে অল্পবয়সী গর্ভধারণে সমর্থ সব কিশোরী, তরুণী ও প্রৌঢ়ার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল। বিরাট বিরাট টাক দেখা দিতে লাগল কারো কারো মাথায়। কারো গালে গজালো একটু একটু দাড়ি।

কারো স্তন বুকের সঙ্গে লেপ্টে যেতে শুরু করল। গলা মোটা হয়ে এলো সকলেরই। কিন্তু তারপরও শারীরিকভাবে তারা কেমন করে জানি নারীই রয়ে গেল। অর্থাৎ কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না তাদের জৈবিক কোনো ভূমিকা পালনেই।

অন্য ব্যতিক্রমটি ঠিক তখন থেকেই দৃশ্যমান। এই অঞ্চলে– চন্দনকর সম্প্রদায়ের ভেতর তখন থেকেই আর কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে না। চম্পা দাসীর মুখভরা এখন দাড়ি। অন্য মেয়েদের মতো সে দাড়ি কামায় না। ফলে তার একদা পেলব গাল ও থুতনিতে এখন ছোট ছোট কালো দাড়ি। সেই সঙ্গে কোমর পর্যন্ত লম্বা কুচকুচে কোঁকড়ানো নরম চুল। দ্বিতীয় দফার গণধর্ষণের পর চম্পা দাসী এখন শুধু কথা বলা থেকেই বিরত নয়, পারতপক্ষে চোখ খুলেও তাকায় না। নিমীলিত বা অর্ধনিমীলিত চোখে সে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়িয়ে মায়াবতীর ধ্যানে সর্বক্ষণ। বিজ্ঞানী এনজিওকর্মী সমাজসেবী, প্রশাসনের কর্মকর্তা অনেকেই বহুবার করে এসেছেন এখানে। চম্পা দাসীকে প্রচুর সাধ্যসাধনা, অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও সে মুখ খোলে নি। কারো কথা বা প্রশ্ন তার বোধগম্য কিনা তাও বোঝা যায় না। চন্দনকরের আপামর জনসমাজ আজ উদ্বিগ্ন। তাদের একসময়কার অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সুশ্রী, সুগঠিত নারীদের এমন পুরুষালি রূপ তাদের আহত করছে, ব্যথিত করছে। কিন্তু তার চেয়েও তারা বেশি চিন্তাগ্রস্ত এই সম্প্রদায়ের সমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনায়। কন্যাশিশু জন্ম না নিলে কেমন করে চলবে? অথচ গত বিশ-বাইশ বছর কোনো মেয়ে জন্মেনি এ অঞ্চলে। এখানকার কিশোর ও তরুণরা তাই ছটফট করছে। নারীসঙ্গবিহীন একাকী অশান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। কী হবে এ জনগোষ্ঠীর? কে বলে দেবে তাদের।

## মায়াবতীর পুরোহিতের বক্তব্য

পুরোহিতের বয়স কমপক্ষে নব্বই। চন্দনকর সমাজে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে পরিচিত। জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন পুরোহিত। ঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প কোনো কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু গত বিশ-বাইশ বছর ধরে– তাই-বা বলি কেন– গত সাতাশ বছরে তিনি যা দেখেছেন, যা ঘটে গেল এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে, তা কখনো দেখবেন ভাবেননি। সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরেছে বৃদ্ধ পুরোহিতকে। চন্দনকর সম্প্রদায় কী ভাবছে, তার নিজের কী ব্যাখ্যা এই ঘটনার, এর থেকে পরিত্রাণেরই-বা কী উপায়? পুরোহিতের বক্তব্য একটাই। মা মায়াবতী অসম্ভব মনঃক্ষুণ্ন। আহত। ব্যথিত। তিনি তখনই আবার সবকিছু ক্ষমা করে দিতে পারবেন, আবার কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করবে এ মাটিতে, যদি সেই সব

নরপশুরা– আসল অপরাধীরা এসে মায়াবতীর কাছে, চন্দনকর মেয়েদের কাছে, বিশেষ করে চম্পা দাসীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষা করে।

## বিজ্ঞানী ও জনসংখ্যা বিশারদদের সাংবাদিক সম্মেলন

সাংবাদিকরা অনেকক্ষণ ধরে জড়ো হয়ে আছে এখানে। অনেক জল্পনাকল্পনা চলছে। বিজ্ঞানী ও জনসংখ্যাবিশেষজ্ঞরা কী ব্যাখ্যা দেবে এ ঘটনার? বেশ কিছু এনজিওকর্মী, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবীও উপস্থিত। আন্তর্জাতিক এই গবেষক দলটি কী তথ্য উন্মোচন করে সকলেই কৌতূহলী আজ তা জানার জন্যে। একে একে মঞ্চে এসে বসেন গবেষকবৃন্দ। না, চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি তাঁরা। এটি নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ঘটনা। প্রাণীকুলের অন্যান্য প্রজাতির ভেতর নানান কারণে কিছু কিছু স্বভাবগত ও চেহারাগত বৈচিত্র্য ও বিচ্যুতি দেখা গেলেও মনুষ্য প্রজাতির ভেতর ঠিক এমনতর ঘটনার উল্লেখ নেই ইতিহাসে। তবে জীবজগতের বিভিন্ন উদাহরণ থেকে বিজ্ঞানীরা এই সংবাদ সম্মেলনের কিছু তথ্য পরিবেশন করলেন, যা থেকে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। নিচে সেগুলো বর্ণিত হলো :

(১) যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ কেরোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গত বছর আবিষ্কার করেছেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সমুদ্রে 'রেসি' বলে একরকম মাছ বাস করে। এদের মধ্যে যাদের মাথার রং নীল, তারা খুব সাহসী। যোদ্ধা প্রকৃতির পুরুষ মাছ এরা। এ প্রজাতির মেয়ে মাছ, শিশু মাছ অর্থাৎ পোনা ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুরুষ মাছদের (যাদের মাথার রং হলুদ) রক্ষক এই নীলমুখো মাছেরা। সর্বক্ষণ তাদের পাহারা দেয়, নিরাপত্তা দেয় অন্যান্য মাছ ও সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীদের হামলা থেকে। কোনো কারণে এই নীল রঙের পুরুষ মাছের অপ্রতুলতা দেখা গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু হলুদ রঙের পুরুষ মাছ ও মেয়ে মাছ আস্তে আস্তে তাদের মুখ ও মাথার রঙ বদলিয়ে নীলমুখো জাঁদরেল এবং সাহসী ঐ পুরুষ মাছগুলোর মতোই হয়ে যায়। তারপর যখন অথবা যদি ঐ আগের নীল মাছগুলো আবার ফিরে আসে, তাহলে এই রূপান্তরিত মাছগুলো আস্তে আস্তে পুনরায় স্ববর্ণ ধারণ করে– আবার নিজের নিজের ভূমিকায় ফিরে যায়। এসবই ঘটে মস্তিষ্ক থেকে এরকম হরমোন নির্গত হবার কারণে। জননেন্দ্রিয়ের হরমোনের কারণে নয়।

(২) ইংল্যান্ডের উপকূলবর্তী বন্দরে ও নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বর্জ্যে-দূষিত সামুদ্রিক জলে বসবাসরত মাছদের অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এদের পুরুষ মাছের পেটে ডিম দেখা যাচ্ছে। তাদের শরীরের হরমোনও মেয়ে মাছের মতো। আবার ওদিকে মেয়ে মাছেদের ডিম পাড়ার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

(৩) ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষিত, কর্মক্ষেত্রে সফল ও প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের অনেকের মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের চেহারায় অন্যান্য পুরুষালি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন– কারো কারো মুখে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, কারো গলা মোটা হয়ে এসেছে। মধ্যবয়সী মহিলা যারা উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণের কাজে নিয়োজিত তাদের ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন বিশেষভাবে নজরে পড়েছে।

(৪) রাসায়নিক শিল্পকারখানায় কর্মরত নষ্ট পরিবেশের শিকার অনেক নারীদের আপনা-আপনি গর্ভপাত হয়ে যায়। এমনকি এ ধরনের পরিবেশে কাজ করে যে-সব পুরুষ, তাদেরও প্রজনন-ক্ষমতায় বিশেষ করে বীর্যের গুণগত মানে অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করা গেছে।।

(৫) অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান এবং কিছু কিছু ঔষধ গ্রহণ পুরুষের প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস করে দিচ্ছে– তাদের শুক্রাণুর গতি ও মান কমিয়ে দিচ্ছে।

(৬) কয়লাখনিতে কর্মরত গর্ভবতী মহিলাদের বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দিতে দেখা গেছে।

(৭) পরিবেশ নির্মল না থাকায় অতিথি পাখিরা আগের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় আর আসছে না। শীতের মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌসুমি পাখি আসার আগে পর্যবেক্ষক পাখিদের একটা ছোটদল সাধারণত আসে পরিকল্পিত স্থান দর্শনার্থে, এরা এসে পরীক্ষা করে যায় পরিবেশ আসলেই যথেষ্ট অনুকূল রয়েছে কিনা। জল, বায়ু ও মাটির যথার্থ পরিবেশ নেই বলে পর্যবেক্ষক পাখিরা সংবাদ দেওয়ার কারণেই অতিথি পাখিরা আর আগের মতো দল বেঁধে আসছে না এখানে। ভবিষ্যতে হয়ত একেবারেই আসবে না।

(৮) পরিবেশ, খাদ্য, ঔষধ, সূর্যের রশ্মি, বয়স, সংক্রামক রোগ, রাসায়নিক দ্রব্য, তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী আঘাত বা ক্ষত প্রাণীর 'জীন' বা ডিএনএতে কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটাতে পারে যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। নানান রকম ক্যানসার হতে পারে এই মিউটেশনের কারণে। মৃত্যুও হতে পারে। এমনকি এগুলো মস্তিষ্কের কার্যাবলি, স্মরণশক্তি বা সৃষ্টিশীলতায় প্রভাব ফেলতে পারে। কোনো কোনো প্রাণী যৌনক্ষমতা অথবা প্রজনন-ক্ষমতাও হারাতে পারে এর জন্য।

এরকম বেশ কিছু তথ্য দেবার পর বিজ্ঞানীরা যেটা পরিশেষে বললেন তা অনেকটা এরকম। চন্দনকরদের নারীদের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা সঠিকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর সেটা হলো এই চন্দনকর নারীরা একটা বিরাট আঘাত পেয়েছে– হয়ত

শারীরিক ও মানসিক দুভাবেই। তাদের জীনে স্থায়ী কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা কেউ বলতে পারে না। এটুকুই বলা চলে, নারীরা এখানে নিশ্চিন্ত বোধ করছে না। তাদের বসবাসের জন্যে যে সুষ্ঠু পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে সে ব্যাপারটিতে নিশ্চয়তা পেলে আবার হয়ত তারা আগের রূপ ফিরে পেত। নারীশিশু জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় শারীরিক উপকরণ ও পরিবেশও তৈরি হবে তখন।

## উপসংহার

বিজ্ঞানী, গবেষকদল ফিরে গেছেন আজ বিকেলে তাঁদের পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কিছু কিছু এনজিওকর্মী, বিদেশি পর্যবেক্ষক, বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক এখনও রয়ে গেছেন চন্দনকরে এত কিছুর পরেও। রহস্যটার জট পুরোপুরি খুলল না তাঁদের কাছে। এখানকার মেয়েদের নিশ্চিন্ত করার জন্যে কী করতে পারেন তাঁরা, কেউ ভেবে পায় না। মায়াবতীর পুরোহিত বারবার বলছে মায়াবতী দেবী ও চম্পা দাসীর কাছে অপরাধীরা এসে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেই কেবল এ পাপ ঘুচতে পারে। কেমন করে তা সম্ভব হবে তারা জানে না।

পরের দিন সকলের শহরে ফিরে যাবার কথা। রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে এক সাংবাদিক ও আরেক বিদেশি পর্যবেক্ষক এসেছে মায়াবতীর মন্দিরে। গভীর রাত। মন্দিরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছে তারা। সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। চারদিক নিস্তব্ধ। মন্দিরের ঠিক সামনে একটা ঝোপের পাশে চুপ করে বসে থাকে তারা দুজন। চুপচাপ কেটে যায় ঘণ্টা দেড়েক। রাত তখন ঠিক বারোটা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারদিক। একটু একটু ফুরফুরে হাওয়া। বাবলা গাছের ঝিরঝিরে পাতাগুলো শর্‌শর্‌ করে নড়ছে। হঠাৎ ওরা লক্ষ করে মায়াবতীর মন্দিরের ভেতর থেকে লম্বা সাদা পোশাক পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী নারী বেরিয়ে আসছে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ তার। কোমর পর্যন্ত কালো চুল। দোহারা চেহারা। সে মন্দিরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। তার পায়ে ঘুঙুর। রিনঝিন শব্দ আসছে পা ফেলার তালে তালে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। ওরা দুজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আস্তে আস্তে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। বারান্দার কাছাকাছি আসতে খুব কাছে থেকে দেখতে পায় নারীটিকে। পরমা সুন্দরী রমণী। কিন্তু হঠাৎ তাদের দেখতে পেয়ে মন্দিরের পেছন দিকে কোথায় মূর্তিটি মিলিয়ে গেল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পেছনের দিকে ছুটে যায়। কিছু দেখতে পায় না। কালবিলম্ব না করে ওরা মন্দিরের সামনের দিকে চলে আসে আবার। কোথায় গেল সেই শুভ্রবসনা নারী? সিঁড়ি ও বারান্দা ভেঙে সদর দরজার

সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। খোলা দরজা। মন্দিরের ভেতর বিশাল মায়াবতীর মূর্তি। কমলা পোশাক পরিহিতা মায়াবতী বসে আছেন সাদা রঙে বিরাট এক বাঘের ওপর। মূর্তির দুপাশে দুটো প্রদীপ জ্বলছে। আর বাঁ-পাশে ধ্যানরতা উপবিষ্টা সুন্দরী চম্পা দাসী। তার পরনে ফকফকে সাদা পোশাক। চক্ষু নিমীলিত। গালে খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি। কোমর পর্যন্ত খোলা কালো চুল। বিদেশি পর্যবেক্ষক অত্যন্ত বিচলিত। চম্পা দাসীর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বাঙালি সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, 'আমি দিব্যি করে বলছি, বারান্দায় হেঁটে চলা ঐ মহিলার গালে একটুও দাড়ি ছিল না। কী মসৃণ ফরসা ছিল তার গাল দুটো! চুলগুলো কিন্তু ঠিক এমনি– এতখানিই লম্বা ছিল। তুমি বিশ্বাস কর। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। খুব ভালো করে দেখিছি।'

উত্তেজিত সঙ্গীকে শান্ত করতে চায় বাঙালি সাংবাদিক। বলে, 'আমি জানি, আমি নিজেও তা দেখেছি।'

## তথ্যপুঞ্জ

১. কিছুকাল আগে একদল ইংরেজ বিজ্ঞানী (এম আর বেইটস্ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ) আফ্রিকার কয়েকটি দেশে দুগ্ধবতী নারীর পুষ্টিতে সম্পূরক খাদ্যের প্রভাবের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, যেহেতু সম্পূরক খাদ্য অপুষ্টির শিকার দুগ্ধদানরতা মায়েদের পুষ্টি বাড়িয়ে দিয়ে তাদের দ্রুত রজঃস্বলা করে তোলে, যা তাদের পুনরায় সন্তানবতী হবার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে পারে, এই সব মায়েদের সম্পূরক খাদ্য পরিবেশন বন্ধ করে দেওয়াই যুক্তিপূর্ণ হবে কিনা সেটা উন্নত দেশের সরকারদের ভেবে দেখা জরুরি।

২. মাথাধরার বড়ির মতো নিভৃতে একটি করে পিল খেয়ে মেয়েদের গর্ভরোধ করার স্বপ্ন দেখতেন মার্গারেট স্যাঙ্গার, যিনি নারীদের ঐচ্ছিক গর্ভরোধের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে, গির্জা ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সারা জীবন লড়াই করে বহু রকম কার্যকরী প্রকল্প গ্রহণ করেন।

৩. 'যাদুর বড়ি' বানাবার জন্যে প্রাথমিক বিজ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করেন মার্গারেট স্যাঙ্গারের বন্ধু ক্যাথরিন ম্যাক্‌কর্‌মিক।

৪. মৌলিক বিজ্ঞানী ড. গ্রেগরী পিন্‌কাস্ হলেন সেই বিজ্ঞানী যিনি মার্গারেট স্যাঙ্গার ও ক্যাথরিন ম্যাক্‌কর্‌মিকের অনুপ্রেরণায় হরমোন বড়ির মাধ্যমে নারীর শরীরে দুটি স্ত্রী হরমোনের মাত্রা কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে গর্ভরোধের পথ খুলে দেন।

৫. ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের ওপরে করা গ্রেগরী পিন্‌কাসের সফল গবেষণাকে মানুষের ওপর প্রয়োগ করে তার সাফল্য নির্ণয় করেন ডাক্তার জন্ রক্।

For more Bangla Books
Please Click HERE

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

# দশম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়